শৈলী

চতুর্থ বর্ষ

শারদীয়া সংখ্যা ২০২৩

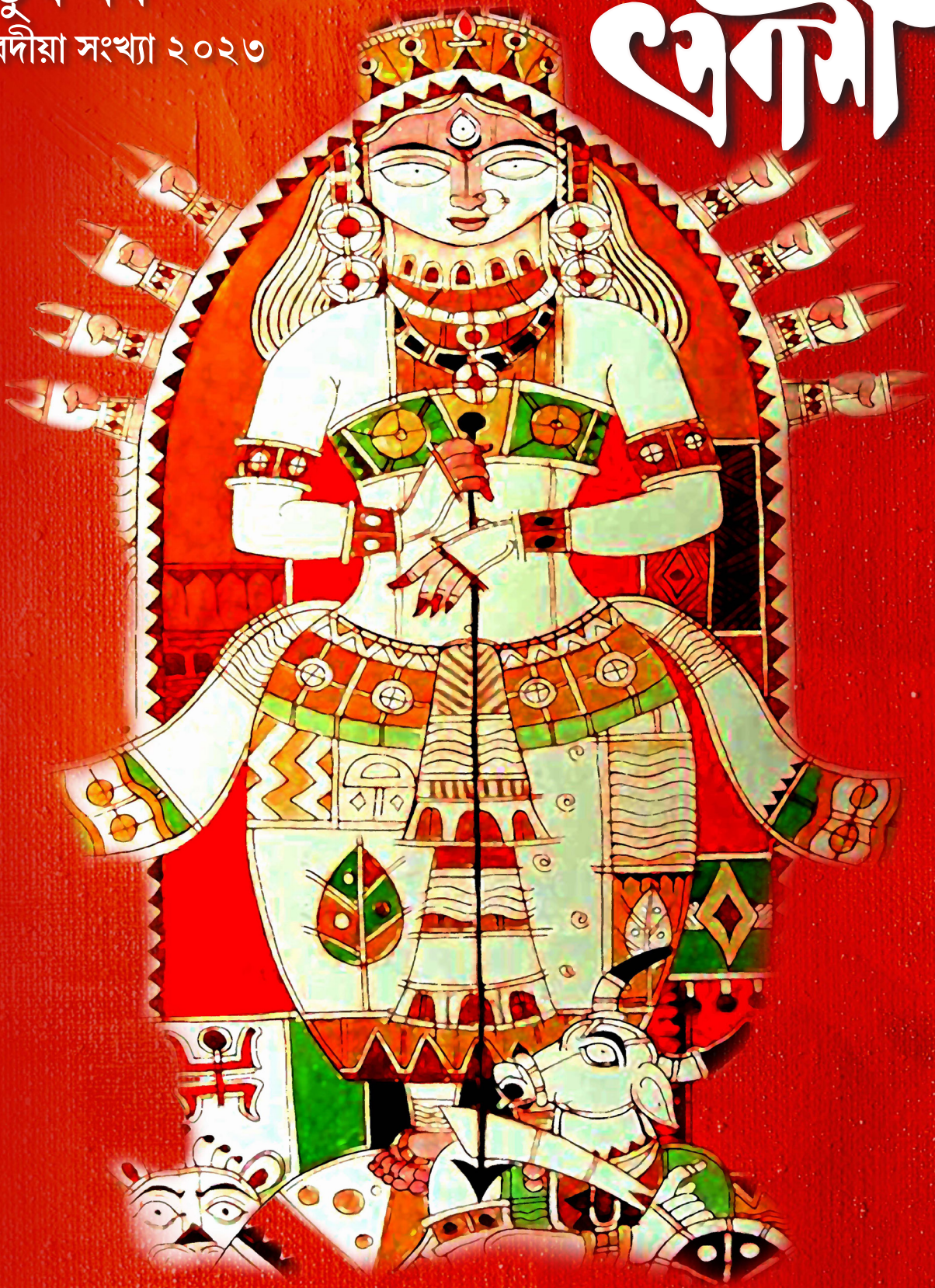

Embrace the Festive Magic

BOLLYWOOD
BEAUTY SALON
You Deserve The Best

CALL: 650-938-2400 | Email: bollybeautysalon@gmail.com
Location 1: 820 E. El Camino Real, Mountain View, CA 94040
Location 2: 2855 Stevens Creek Blvd,
Store No.: 1065 Santa Clara, CA 95050 (Westfield Valley Fair Mall)

Travel Medical Insurance

Group Medical Insurance

Life Insurance

1339 VP 070922

info@VisitorPLANS.com

855-5-VISITOR • 855-584-7486 • 510-353-1180

VisitorPLANS.com
INSURANCE THAT TRAVELS WITH YOU

www.VisitorPLANS.com

MCIS Multichoice Insurance Services LLC | California License # 0G33251

Savor the Divine Sweetness of Durga Puja!

CALL: (408)244-1160
OPEN All DAYS | 1:30 AM - 2:00 PM and 5:00 PM - 9:30 PM
Location: 1584 Halford Ave, Santa Clara, CA 95051

‘‘বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো রে ভুবন’’

Dear Prabasi community,

It’s that time of the year again; Bay Area reverberates with the echo of conch shells and the beat of dhaak as we celebrate the most joyous occasion of the year, Durga Puja. Despite this being a challenging year, Bay Area Prabasi has been able to thrive as a quadragenarian - bringing you a diverse range of offerings to enjoy the festival in the best possible way as we gear up for our golden jubilee celebrations.

During this festival season, we continue to honor our long-standing commitment to give back through two initiatives - the first one involving supporting the rural handicraft of Bengal-a sector representing the economic lifeline of the vulnerable sections of the society by sourcing handcrafted eco-friendly decoration for Puja mandap. Second- project Wash- an initiative to support water, sanitation, and hygiene in schools which we launched earlier this year.

Challenge and growth, the year provided a wealth of both, continuing to bring together a group of resilient people who have been, perhaps, my greatest source of inspiration.

I thank all volunteers, board members, committee members, sponsors, and donors for their unwavering support through our journey and I am confident that we can and will thrive in the years ahead, continuing with our distinctive efforts and mission.

With gratitude to you all,
Bitan Nandi Biswas (Chairperson/President)

শারদীয়া ১৪৩০
অক্টোবর ২০২৩

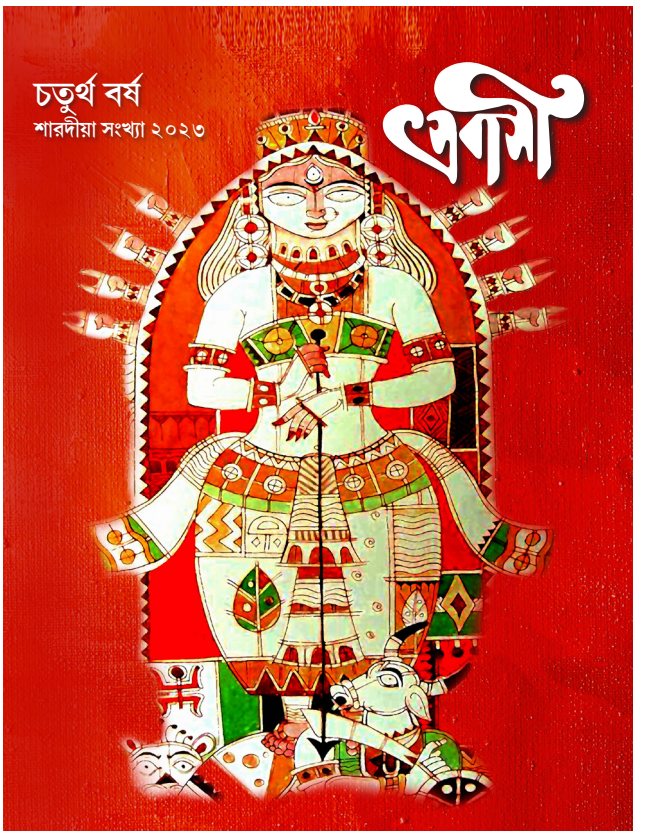

চেয়ারম্যান মেসেজ ৫

সম্পাদকীয় ৯

বিশেষ রচনা

নবকুমার বসু ১০

দেবশঙ্কর হালদার ১৬

বিশ্বনাথ বসু ১৮

ছোটোগল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩০

প্রচেত গুপ্ত ৩৬

সিজার বাগচী ৪২

কবিতা

সুবোধ সরকার ৪৮

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ৫২

প্রচ্ছদ: সুমন মণ্ডল

সম্পাদনা: উল্লাস মল্লিক

সমন্বয় সাধন: দীপংকর সেন

অলঙ্করন: রমাপদ পাহাড়ী,
অমিত মজুমদার, শ্রীতমা রক্ষিত

রম্যরচনা

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪

সুমন সরকার ৫৮

ইমোজ অফ কালী ৬৬

রূপান্তরিত অর্ধশতবর্ষে প্রবাসী ৭০

তুলিকলা ৭৪

৭৫

Officers:

Chairperson	:	Mrs. Bitan Nandi Biswas
Treasurer	:	Mr. Saikat Paul
	:	
	:	

Member Board of Directors:

Dr.Prasanta De
Mr. Somnath Sen
Dr. Supratik Bose
Mr. Abhijit Datta
Dr. Jayashree Ray
Ms. Urmi Chakraborty
Mrs. Saoli Biswas
Mr. Anjan Das
Mr. Srijoy Aditya

Advisory Council:

Dr. Ranjit Chakravorti
Dr. Anuradha Luther Maitra
Mrs.Sudeshna Raha
Dr. Sudip Chattopadhyay
Mr. Tirthankar Lahiri
Mr. Debanjan Saha
Mr. Sudipto Mukhopadhyay
Mr. Jishnu Bhattacharjee

Cultural Advisors:

Mr. Anindya Chatterjee
Mrs. Mamata Shankar
Mr. Sanjib Bhattacharya
Ms. Samita Sen

পঞ্চাশতম বর্ষে শতফুল বিকাশের অঙ্গীকার

পথ চলতে চলতে পঞ্চাশ। অর্ধ–শতাব্দী। কোনও সংগঠনের পক্ষে এ বড় সহজ কথা নয়। একটা অর্ধ–শতাব্দীতে পৃথিবীর বদল হয় অনেকটা। মানচিত্রে, প্রকৃতিতে, জীবনযাপনে। তো সেই অর্ধ–শতাব্দী আগে সাগরপারে বসবাসকারী কতিপয় বাঙালি–চিন্তক ভেবেছিলেন অন্য রকম করে। শুধু ব্যক্তিস্বার্থেকেই মোক্ষ না ভেবে, ভেবেছিলেন বৃহত্তর স্বার্থের কথা। গড়ে তুলেছিলেন এক সংগঠন। প্রবাসী। লক্ষ্য, সেবামূলক কাজ এবং সাহিত্য–শিল্প–সংস্কৃতির চর্চা। শুরু হল বঙ্গ সম্মেলন। আত্মপ্রকাশ করল সাহিত্য পত্রিকা 'শঙ্খ'। সেই থেকে টানা এতগুলো বছর, নিয়ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, সেই লক্ষ্যে অবিচল। এর মধ্যে 'শঙ্খ' নাম বদলে হয়ে গিয়েছে 'প্রবাসী (বে এরিয়া)'। সেই বদল শুধু বহিরাঙ্গেই। বৌদ্ধিক চর্চায় সে আজও প্রথম সারিতে।

এবারও সময় এসেছে তার সজ্জার। সেজে উঠেছে প্রকৃতিও। ভুত্তণ্ডি মেঘগুলোকে কারাগারে নিক্ষেপ করে নীল আকাশ তার বুকে ভাসিয়েছে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা। ফুলবাবুর মতো তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। কাশফুলের দল যেন এ–ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। ভোরবেলায় শিউলি গাছের তলায় শিশিরভেজা শিউলি ফুল। এমন সাজানো পথেই তিনি আসছেন। আর আমরা তাঁকে বরণ করে নেব ফুল প্রদীপ শঙ্খধ্বনি, মন্ত্রে। আর নেব সাহিত্যে। আমাদের বরণডালা সাজানো বাংলা সাহিত্যে শীর্ষবিন্দুতে আছেন যাঁরা, তাঁদের সৃষ্টিতে। আপন সৃষ্টি নিয়ে থাকছেন নতুন প্রতিভাও। প্রবীণ–নবীনের সমন্বয়ে সুবর্ণ বর্ষে এ এক ব্যতিক্রমী শারদ অর্ঘ্য।

সবশেষে প্রিয় পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীদের হার্দিক শারদ শুভেচ্ছা। সকলকে সঙ্গী করে, সঙ্গে নিয়ে সংস্থার পঞ্চাশতম বর্ষ বিকশিত হোক শতফুলে।

উল্লাস মল্লিক
সম্পাদক

হারিয়ে পাওয়ার তুষ্টি

নবকুমার বসু

অগ্রণী সাহিত্যিক। বিশিষ্ট চিকিৎসক। প্রবাসী বাঙালি। ব্যাডমিন্টন, ভলিবলে তুখোড়। তবলা, খোল, মৃদঙ্গ, মাউথ অরগ্যানে ঈর্ষণীয় প্রতিভা। বাবা সমরেশ বসু ও মা গৌরী বসুর জীবনভিত্তিক উপন্যাস 'চিরসখা'র স্রষ্টা। প্রায় আড়াইশো ছোট–বড় গল্প, চল্লিশটির বেশি উপন্যাস, অজস্র প্রবন্ধের লেখক। কিশোর কাহিনী, রহস্য উপন্যাসেও পারদর্শী। সেরা বাঙালি, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, ইউকেবিসি–র লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সহ বহু দেশি–বিদেশি পুরস্কারে ভূষিত।

বিলেতের অটাম–এ দিন ছোট হয়ে এল। তবু রাত ন'টাতেও আলো এখন। পশ্চিমাকাশে গেরুয়া মায়া আলোর উদ্ভাস। আর আশ্বিনের মাঝামাঝি আমি শুনতে পাচ্ছি বাজনা বেজে উঠেছে।

দিনক্ষণ তারিখ আর আলাদা করে হিসেব করতেও হয় না। প্রবাসে কেটে গেল এত বছর। তবু বাজনা বাজে এখানেও, এখনও। আসলে অটাম বলা হোক বা অন্যকিছু, তবু আকাশবাতাস, গাছপালায় সেই তো শরৎ... অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া...! সত্যি কী আশ্চর্য, নেহাত শিউলি ফুলটা ফোটে না এদেশে। তা সত্ত্বেও শরৎকাল সন্দেহ নেই। বিলেতে যে এত কাশফুল ফোটে কে জানতো!

চার ঋতুর দেশে জুন–জুলাই–অগাস্ট চলে গেছে সামার। অটাম এসেছে গতমাস সেপ্টেম্বর থেকে। আসছি–আসব করছিল। জানান দিতে শুরু করল গাছের পাতারা। রং বদল হচ্ছিল। হাওয়ায় শিরশিরানির সঙ্গেই গাছের পাতায় হলুদ–লাল–গেরুয়া–বাদামি ছোপ। আসন্ন ঝরার কাল। একটু দেরি আছে এখনও, এরও সেই যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়ার

আয়োজনই বুঝি!

গাছে গাছে পাতারাই যেন সাজিয়ে দিচ্ছে দেশটাকে। আমি শরতে ফুলের দ্বিতীয় ঋতু দেখি। কী মন্থরতা, থম ধরে রয়েছে প্রকৃতিজুড়ে। পালাবদলের টানাপোড়েন যেন শেষ হচ্ছে না। আকাশ এখনও গভীর নীল। খড়ির দাগ টেনে জেট বিমান ঠিকানা বদল করে বিনবিন শব্দে যাচ্ছে বহু উঁচু দিয়ে। ঝিরঝিরিয়ে হাওয়া আসে। কনকনানি মিশে থাকে। তবু হাঁটতে গিয়ে যখন দেখি ঘরে ঘরে কাশফুলের মাথা উদাসী হাওয়ায় সাদা সাদা দুলছে, আমি টের পাই... উঠিছে বাজনা বাজি।

এখন আর দেশে তেমন হয় না। অতীতে শরৎকাল তো তেমনই ছিল। পড়ন্ত বিকেল, একটু হাওয়া, শান্ত গোধূলি।

মফস্সলের মানুষ আমরা। সারা রাতের হিম কুয়াশা টুপিয়ে পড়েছে উঠোনের ঘাসে শিশির হয়ে। শিউলি ফুলের গন্ধ ছেয়ে রয়েছে ভেজা ভেজা বাগান ছাড়িয়ে আমাদের অর্ধেক কাঁচা আর অর্ধেক পাকাবাড়ির আড়াইখানা ঘরে। একটা কাঁচা আর একটা পাকা ঘরে মা-ঠাকুমার সঙ্গে আমরা ভাইবোনেরা। আধখানা টালিখোলার চাল দেওয়া ঘরটা বাবার একলা শোওয়ার। লোকটা সারাদিনের পরেও পুজোর সময় রাত পর্যন্ত লেখে। লেখার শ্রমিক আমার বাবা। কাকে যে লেখক বলে জানি না। শুধু দেখি মায়ের মুখে আলো ফোটে, যখন বলে, 'তোদের বাবা একজন লেখক তো!' আমরা সেই লেখক বাবার জন্য সাজি ভরে উঠোন থেকে শিউলি ফুল তুলতে যেতাম। দিদি সুতো দিয়ে মালা গেঁথে নিঃসাড়ে বাবার আধখানা ঘরে টেবিলের পাশে একটা জামবাটিতে সেই মালা রেখে দিয়ে আসত ভোরবেলা। বাবা শিউলি ফুলের গন্ধ নিয়ে ঘুম থেকে উঠবে... আবার পুজোর লেখা নিয়ে বসবে।

ফুল তুলতে উঠোনে যাওয়ার সময় খালি গা, মা বলত জামাটা গায়ে দিয়ে যা বাবা। আবহাওয়া পালটানোর সময়। নতুন হিম পড়ছে। ঠান্ডা লেগে জ্বর হবে। শরতের হাওয়ায় তখনও ঠান্ডার আমেজ ছিল দেশে। এখন আর নেই। কতকিছুই নেই। মফস্সলের বাড়ি নেই, বাবা নেই, মা নেই, হিমের শিশির পড়ার মতো ঘাসজমিও নেই দেশে। পুজো আসছে, পুজো আসছে আবহাওয়া নেই। পাড়ার মাঠে প্যান্ডেলের বাঁশ পড়ে না। পাড়ার পুজোর নতুন নাম হয়েছে আবাসনের পুজো। পাড়া উঠে গিয়ে সেই মাঠে বহুতল আবাসন হয়েছে। সেখানে পুজো-পুজো গন্ধ নেই।

আবার কত কিছু 'আছে'ও, হয়েছে। কিন্তু সেই 'আছে'তে মন সাড়া দেয় না দেশে গিয়ে।

শহর ছেড়ে গঞ্জ-মফস্সলেও এখন হয়েছে

লেখার শ্রমিক আমার বাবা। কাকে যে লেখক বলে জানি না। শুধু দেখি মায়ের মুখে আলো ফোটে, যখন বলে, 'তোদের বাবা একজন লেখক তো!' আমরা সেই লেখক বাবার জন্য সাজি ভরে উঠোন থেকে শিউলি ফুল তুলতে যেতাম।

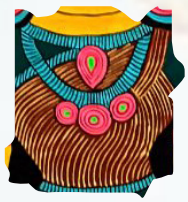

আবাসনের পুজোর আড়ম্বর। বাঁশ–চট–ত্রিপল আর দড়ি দিয়ে বাঁধা প্যান্ডেল, ম্যারাপ বাঁধা হয় না। রঙিন কাপড়ের ডেকরেশন, সানরাইজ হয় না। জিবেগজা–জিলিপি–অমৃতির দোকান বসে না প্যান্ডেলের অদূরে। তখন খবর হয়ে যেত আগে থাকতে। কাঁঠালপাড়ার রূপমন্দিরে পাড়ার ঠাকুরের বায়না হয়েছে। মাঠ থেকে খেলার পরে ফিরে আসার পথে, নিয়ম ছিল একবার পাল কোম্পানির রূপমন্দিরে সদলবলে ঘুরে আসা। অধীর প্রতীক্ষা ছিল, কবে খড়–বিচুলির কাঠামোর ওপর গঙ্গামাটি পড়বে। মাটি শুকোনোর আগেই প্রতিমার দেহ সৌষ্ঠব রচনা হচ্ছে। ফুটে উঠছে অসুর–সিংহ–মহিষ আর দশভুজা। কল্পনার চোখে দেখছি––দেবী দুর্গার এক পা সিংহের পিঠে, আর এক পা অসুরের বুকের ওপর রেখেই তাকে সংহারে উদ্যত। উহ্, কবে যে প্রতিমার শরীরে ঘামতেল পড়বে!

তার মধ্যেই এক ভোরে আকাশবাতাস উচ্ছ্বসিত করে পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শুরু হল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর সানুনাসিক কণ্ঠে। আমাদের বাড়িতে তখনও রেডিও নেই। তাতে কী! পাড়ার সব বাড়ি থেকেই সেদিন ফুল ভলিউমে রেডিও বাজে, যাদের রেডিও আছে। আমরা ঘরের আলো–আঁধারির মশারির নীচে শুয়ে 'বাজল তোমার আলোর বেণু' শুনতে শুনতে আবার কখন ঘুমে তলিয়ে গেছি!

তারপরেই যেন অনন্ত প্রতীক্ষা। কবে আমাদের পাড়ার প্যান্ডেলে ঠাকুর আসবে!

সেই প্রতীক্ষার আর এক নাম ছেলেবেলা। সেই বেলায় মিশে থাকত নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ।

তারপর এক সকালে নৈহাটি রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম কেঁপে উঠত গুমগুম করে বেজে ওঠা ঢাকের শব্দে। আর সেই শব্দ কাঁপা কাঁপা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ত পাড়ায় পাড়ায়।

এখনও আমি ঠিক টের পাই আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিছে বাজনা বাজি। শুধু অন্য কেউ শুনতে পায় না, আমি পাই। বিলেতের শান্ত বিকেলে লন্ডন থেকে অনেকটা দূরের বাড়ির দোতলার জানালা থেকে আমি দেখি, পড়ন্ত অটামের আলোয় সাদা কাশফুলের মাথা মৃদু হাওয়ায় দুলছে। বড় চুপচাপ, প্রায় শব্দহীন দেশটা। ঝুপ শব্দ করে একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হয়। কিংবা ঠক ঠক জুতোর হিলের শব্দ তুলে চলে যায় কোনও মেমসাহেব। একঝাঁক ম্যাগপাই চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ করে হামলে পড়ে অটামের ভেজা মাটির ঘাস থেকে পোকা খুঁজে পাওয়ার জন্য। দিনের আলোয় লালচে ছোপ, গাছের ছায়ারা লম্বা হয়ে পড়েছে ফুটপাথ অতিক্রম করে অন্যদিকের বাড়ির ঢালু টালির চালের ছাদে। কোথাও কোনও ব্যস্ততা, তাড়াহুড়ো নেই। আমিও ভাবনার ঘরে কুলুপ এঁটে রাখি। আবেগ বেসামাল হতে দিই না। এই বয়েসে আর তা মানায়ও না। নয়তো পুজোর অনুভবে পুলক আমার চিত্ত অধিকার করে জুতো সেলাইয়ের বদলে শুধু নীরবে চণ্ডীপাঠই করে চলবে। এ পরবাসে তা নাস্তি। তোমার পুজো তোমার মনে। তোমার কর্ম তোমায় করতে হবে। যস্মিন দেশে যদাচার। গোড়ার দিকে ছটফট করতাম পুজোর সময় এগিয়ে এলে। কিছু করার নেই, নাড়ির টান। তারপর থিতিয়ে গেলাম। মানতে যখন হবে, তখন নিজেকে গড়েপিটে নিতে পারলেই ভালো। অনেক বছর পরে একবার পুজোর সময় বাড়ি গিয়েও তো দেখলাম, সেই পুরোনো আবেগ আমার ঠোক্কর খাচ্ছে পদে পদে। ঘরে–বাইরে, আকাশ বাতাস প্রকৃতি, রাস্তাঘাট–বাজার–মানুষজন কোথাওই আমার সেই স্মৃতির আবেগ হামলে পড়ছে না তো! গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আকাশ কেমন একটা ফ্যাকাসে ছাই রঙে গুমোট গম্ভীর হয়ে থাকে। হঠাৎ কখনও নীল তো, রোদের তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। ছাগল–তাড়ানো একপশলা বৃষ্টি যদি–বা হল, মাটি গরম করে দিয়ে গেল আরও। ভাপ বেরুচ্ছে গরম প্রশ্বাসের মতো। কোথায় গেল সেই ফুরফুরে মন্দমধুর হাওয়া। যে হাওয়ায় ভেসে আসত দূরের ঢাকের ঢ্যাং কুড়কুড়! জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। মানুষ ভীষণ ব্যস্ত, ছুটছে। রাস্তাঘাটে ভিড়, তার মধ্যে আন্দোলন, মিছিল... চলবে না, চলবে না। তাপ্পি মারার কাজ চলছে, সদ্য শেষ হওয়া বর্ষার জলে চলটা উঠে যাওয়া রাস্তায়। তার মধ্যেই শয়ে শয়ে গাড়ি অটো–বাস–ঠেলা। এমনকি আবাসনে আবাসনে প্যান্ডেল বানাতে যাওয়া বাঁশের ভ্যানরিকশা। দরদরিয়ে ঘামছে মানুষ, গরমে মেজাজ হারিয়ে অমার্জিত মুখের ভাষাও। সুজলা, সুফলা বঙ্গদেশে

স্বর্গের দেবী দুর্গা, মর্ত্যের মেয়ে উমা হয়ে নেমে আসবেন কয়েকদিন পরেই। বাপের বাড়ি নির্বিঘ্নে পৌঁছোতে পারবেন তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে!

দিনে দিনে বদলে গেছি আমিও।

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি আমার এই অটামেই ভালো। বলতে পারি মন্দের ভালো। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে বিলেতেও গরমকাল আসে, তবে তা মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের জন্য। তারপরেই টের পাওয়া যায় হাওয়া ঘুরছে। সূর্যেরও দক্ষিণায়ন। প্রাচীন বঙ্গসন্তান জানে, পুজো আসছে। আর এদেশ জানে, অটামে আসছে হ্যালোউইন আর গাই ফকস-ডে। বাঙালি ভাবছে কাছেপিঠের কোন শহরে দুর্গোৎসব হচ্ছে!

না, খুব বেশি ভাবতে হয় না আর। ষাটের দশকে (গত শতাব্দী) একটা-দুটো করে রাজধানী লন্ডনে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। নতুন শতাব্দী আসার আগেই সেই পুজো বড়-সেজো-ছোট শহর তো বটেই, গঞ্জ-শহরতলিও আর বাদ থাকছে না। নেহাৎ দেশটার পাড়ায় পাড়ায় এখনও বাঙালি নেই (বাংলাদেশি থাকলেও থাকতে পারে), তা নয়তো আমার আসার প্রান্তিক শহরেও হয়তো একটা পুজো নামত। তাহলেও খুব বেশি দূরে আর যেতে হয় না। বিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে একটা-দুটো চয়েসও এসে যায়— এই পুজোয় যাব, নাকি ওটায়... নাকি একদিন করে দুটোতেই? এদেশে ওটুকু দূরত্ব কিছু না।

দলবল যেখানে জোটে, আমিও সেখানে যাই।

একদিন প্রবল উদ্যামে যেখানে নিজেও মেতে উঠেছিলাম, আজ সেই দুর্গাপুজোই তিন ভাগ হয়েছে। দল ভাঙে বলেই দল গড়ে। মাঝেমাঝে শুনি, ডাক্তারদের বিলেতে আসা কমে গেছে (বিলেতে বাঙালির শতকরা আশিজনই ডাক্তার)। কিছুটা

হবে হয়তো, কিন্তু পুরোটা সত্যি নয়। বিলেতে কাজ করতে আসার হ্যাপা বেড়েছে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও আসছে। এমনকি পড়াশোনা করে ফিরে যাওয়ার পরেও আবার সুযোগ পেলে চলে আসছে। সুতরাং নতুন প্রজন্মও রয়েছে।

আর বাঙালি থাকলে দুর্গাপূজাও হবে সেটাও সত্যি। কিন্তু আশ্বিনের মাঝামাঝি রীতিমতো ঠান্ডা যে! পুজোর জন্য হল ভাড়া করতে হবে। এক-আধদিন নয়, অন্তত চার-পাঁচ দিনের জন্য তো নিতেই হবে। মঞ্চ থাকতে হবে, তখন সমতল মেঝেও থাকতে হবে। লাগোয়া কিচেন থাকার দরকার, কারণ, পুজো মানেই ভুরিভোজের পেটপুজোও। থাকতে হবে কার পার্ক। সুতরাং শুধু পুজো দেখলে হবে। খরচা আছে।

দুর্গোৎসব বলে কথা, আয়োজন নেহাৎ কম না। এমনিতেই বাঙালি সংস্কৃতি তথা কালচার ছাড়া থাকতে পারে না। কালচারের জন্য উপলক্ষ্যেরও অভাব হয় না। নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন-উপনয়ন, রজতজয়ন্তী কিছু একটা তার সঙ্গে ইদানীং জুড়ে গেছে নাটক-পিকনিক-প্রসাদের নামে সান্ধ্যভোজের আয়োজন করা মুখের কথা নয়। হোক তা নিরামিষ, তাহলেও এক তরকারি ভাতে বাঙালির ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পোলাও-খিচুড়ি-তরকারি-বেগুনি-চাটনি-পাঁপড়-মিষ্টির ব্যবস্থা বিলেতেও করতে হবে বৈকি। কারণ, প্রতিযোগিতা আছে সেখানেও।

দূরভাষে গিন্নিদের কথোপকথনে বার্তা রটে যায় শহর থেকে শহরতলিতে।

সে কি বউদি, জানো না! বার্নসলে পুজোয় এবার তো নবমীর দিন মাংস হচ্ছে।

তাই নাকি! তাহলে বাবা সেদিন আর লিডস-এ যাব না।

টানাপোড়েন চলে পুজোর পুরোহিত নিয়ে। প্রথমদিকে শুনেছিলাম, দু-একজনকে নাকি দেশ থেকে উড়িয়েও আনা হয়েছিল। দুর্গার পরে একেবারে লক্ষ্মী-কালী সেরে, লন্ডন বেড়িয়ে ফেরার জন্য। ইদানীং আর দরকার হয় না। কেউ কেউ ভালোবেসে, শুদ্ধাচারী হয়ে, ব্রাহ্মণত্ব নিবেদন করে পুরোহিত হন। কেউ আবার গ্ল্যামার আর জাতে ওঠার বাহানায় দেশ থেকে নামাবলী আর গরদের উড়ুনি নিয়ে এসে অংবং

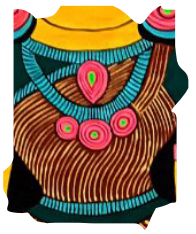

নতুন প্রজন্ম পুরো সংস্কৃতিটা বুঝে ওঠে না। ধর্মভাব বলেও খুব একটা বোধ তৈরি হয় না, নেহাত 'ঘর ঘর কা কহানি' হিসেবে বাড়িতে যেটুকু অথবা যদি পুজোআর্চার কিছু ব্যবস্থা থাকে। সেখান থেকে একটু শেখে হয়তো। ইদানীং তাদেরও আকর্ষণের নতুন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে বিলেতের পুজোয়।

ছেলেমেয়ের পাশ করা এবং বিয়ে খাওয়া, এমনকি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া বা গৃহপ্রবেশ। বলা যায় না, আনন্দময় বিবাহবিচ্ছেদেও কোনও দিন পার্টি হবে কিনা। কিন্তু যেটাই হোক, নিজের আইডেন্টিটি খুঁজতে বাঙালি ঘরে সত্যনারায়ণের পরে একটা সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নেবে।

বছর বছর ঠাকুর তথা প্রতিমা আনা যায় না দেশ থেকে। ঠাকুর রাখা থাকে কোনও অর্থবান ডাক্তারের বড় বাড়ির ডবল গ্যারাজে। সেখান থেকে হলে আনা-নেওয়ার ব্যাপার আছে এবং মঞ্চে তোলার। তারপর যেটুকু সম্ভব অন্তত সাজানো। বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত পুজো আয়োজনের আচারবিধি পালন, জিনিসপত্র বাসনকোসন জোগাড় করা নেহাৎ কম শ্রম এবং হিসেবনিকেশের ব্যাপার নয়।

কোশাকুশি-ঘণ্টা-প্রদীপ থেকে শুরু করে পূজা উপাচারের ফুল-মালা-ধূপধুনো-চন্দন-গঙ্গাজল-পদ্মফুল--কেউ না কেউ তো জোগাড় করেই। বিশাল ফর্দ করতে হবে বাজার করার জন্য। অন্তত তিনটে দিন শুক্র-শনি-রবি কমপক্ষে শ-দুয়েক লোকের উচ্চারণে পৌরহিত্য করে। কিন্তু সত্যি তো খেটে মরে কজন। নিবেদিত প্রাণ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো নেমে পড়ে দুর্গাপুজো করতে। কাজ থেকে অতিরিক্ত ছুটি নেয়। গাড়ির তেল খরচা করে দৌড়ঝাঁপ করে। বডি ফেলে বাজার, রান্না করে।

নতুন প্রজন্ম পুরো সংস্কৃতিটা বুঝে ওঠে না। ধর্মভাব বলেও খুব একটা বোধ তৈরি হয় না, নেহাত 'ঘর ঘর কা কহানি' হিসেবে বাড়িতে যেটুকু অথবা যদি পুজোআর্চার কিছু ব্যবস্থা থাকে। সেখান থেকে একটু শেখে হয়তো।

ইদানীং তাদেরও আকর্ষণের নতুন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে বিলেতের পুজোয়। বিশেষ করে বাবা-মায়েরা উৎসাহিত করছেন কলেজ পড়ুয়া অথবা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের পুজোয় আসা এবং অন্য অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, মেলামেশা, বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য। তা নয়তো কার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে বসবে কে জানে! পুজো মানে কমিউনিটির ভিড়। দেখা এবং দেখানো, উভয়েরই আয়োজন। সামাজিকতার নামে পাত্র-পাত্রী দেখার সুযোগ হয়ে

গেলে আপত্তির কী আছে সাহেব-মেম পাত্র-পাত্রী জুটলে। একসময় বাঙালি খুশি হত। পরে দেখেছে, সাদা গায়ের রং হলেই উপযুক্ত বউমা বা জামাই হবে, এমন কোনও কথা নেই, তার চেয়ে যদি প্রবাসী-প্রবাসীর মধ্যেই...। আসলে বাঙালি আছে বাঙালির মতোই।

স্মৃতির আবেগ ধরে রাখা আমার প্রজন্ম তবু ভাবে, দেশের চেয়ে বিলেতের এই পুজোই ভালো। পৃথিবী ছোট হয়েছে বলে থিম পুজোর রোশনাই দূর থেকেই দেখা যায় ভালো। বাকি আর কী সুখ আছে দেশে দুর্গাপুজোর সময়? শরতের হাওয়ায় গা শিরশিরও করে না, ঠাকুর দেখার আনন্দও নেই। ভাবি, 'সিনিক' হয়ে যাচ্ছি নাকি! কিন্তু না, তারপরেই মনে হয় বোধহয় এই ভালো— একটু দূরে বসে মাতৃদর্শন, আরতি দেখা, নিজের মতো অঞ্জলি দেওয়া। আর যাই হোক না কেন, দুর্গাপুজোর নামে মোচ্ছব, রাজনীতি আর সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে কোথাও স্তব্ধ, কোথাও এলোমেলো আর কোথাও মাফিয়ারাজ করে তোলার পরিস্থিতি অন্তত বিলেতে হয়নি, হবেও না।

অনেক কিছু হারাই বটে। তবু হারিয়ে পাওয়ারও কিছু তুষ্টি আছে।

Best compliments from

Chhat Bhavan

ইয়ং সর্বেশ্বরীপূজা, যন্ময়া দেবি তে কৃতা।
পূর্ণা ভবতু সা সর্বা ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥
হে দেবী আমি সর্বেশ্বরীর পূজা করলাম। হে মহেশ্বরী এই পূজা পূর্ণ হোক তোমার অনুগ্রহে।

দেবশঙ্কর হালদার

জন্ম ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৫। অভিনেতা, নাট্যপরিচালক, নাট্যচিন্তক, সঞ্চালক, লেখক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দীর্ঘকাল যুক্ত থেকেছেন নান্দীকার, শূদ্রক, গান্ধার, ব্রাত্যজন–এর মতো বিখ্যাত নাট্যদলের সঙ্গে। 'মহুলবনীর সেরেং', 'হার্বার্ট', 'অ্যাক্সিডেন্ট' সহ বহু মূলধারার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। এবিপি আনন্দ সেরা অভিনেতা, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত।

স্মৃতির সরণি বেয়ে

এই শহর জানে আমার সবটুকু

কলকাতা। এই শহরের অলি–গলি–পাকস্থলী, সবটুকুই আমাকে চেনে, আমিও ভীষণভাবে চিনি এঁদো গলি থেকে যত রাজপথ, তার অনেকটাই।

আমার যেখানে জন্ম সেখানে গলি, তস্য গলি উজিয়ে পৌঁছোতে হয়। পাইকপাড়া অঞ্চলে যেখানে আমার জন্ম, সেই ভিটেমাটিতে আজও আমার যাপিত জীবন। আমার অন্য ভাইদের সঙ্গে ওখানেই সুখে–দুখে দিন কাটে বেশ।

শৈশবে, সেই হইহই আনন্দ দিনে বাড়ির কাছের স্কুলে পড়াশোনা, খেলে বেড়ানো, স্বপ্ন দেখা এবং আরও কত কি! স্বপ্ন ছিল খেলোয়াড় হব, হয়ে গেলাম অভিনেতা। সে বোধহয় জিনগত দোষে! আসলে আমার বাবা অভয় হালদার ছিলেন অভিনেতা। যাত্রা জগতের মানুষ। তিনি অভিনয়ের সুবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। বাড়িতে খুব কমই থাকার সুযোগ পেতেন। বাবার কারণেই ছোটবেলায় পুজোর সময় খুব যাত্রা দেখে বেড়িয়েছি। হয়তো তাঁর দেখাদেখি আমাদের ভাইদের মধ্যেও অভিনয়ের ইচ্ছেগুলো জাঁকিয়ে বসত। মায়ের শাড়ি, বাড়ির এটা–ওটা–সেটা নিয়ে নিজেদের মতো মঞ্চ বানিয়ে আমরা অভিনয় করতাম। কিন্তু সেই অভিনয়ই যে আমার জীবনে রুটিরুজি হয়ে উঠবে, আর কোনো কাজেই যে আমার যুতে থাকা সম্ভব হবে না, সেসব বিন্দুমাত্র আমার বোধের মধ্যে আসেনি।

সে যাই হোক, কলকাতা আমার কাছে একই সঙ্গে আদিম এবং আধুনিক। সত্যি বলতে, এটাই কলকাতার আসল মজা। একদিকে উত্তর কলকাতার গলিঘুঁজিতে দাঁড়িয়ে

থাকা আদ্যিকালের হাড়-পাঁজর বের করা বাড়ি-ঘরদোর, অন্যদিকে তার গা ঘেঁষে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বিশেষ করে ঝাঁ-চকচকে দক্ষিণ কলকাতার বিত্ত-বৈভব—প্রকৃতপক্ষে এক কনট্রাস্ট।

এই যে অজস্র গলি, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বাড়ি, হিলহিলে সাপের মতো এলোমেলো হয়ে যাওয়া গলি থেকে কানে ভেসে আসে সব ধ্রুপদী সুরের মূর্ছনা। আবার অনেক রাতের কলকাতা, সে যেন চুপকথা বলে। অন্য এক সুর ভাঁজে। সেই সুর আমাকে শান্তি দেয়, স্বস্তি দেয়। আরাম দেয়। ভোর হতে না হতেই এই চুপকথার কলকাতা আবার অন্য রূপে, ভিন্ন মেজাজে। অন্য রাগে, ভিন্ন বর্ণমালায়। সেই গানের স্বরলিপি আবার অন্য প্রকৃতির। শহরজুড়ে এত যে বৈচিত্র্য, নানাবিধ শব্দ, ধ্বনি, স্বর, সুর, ভালোবাসা-না ভালোবাসা, জানি না পৃথিবীর অন্য কোনো শহরের এমন বিচিত্র রূপ-ঐশ্বর্য আছে কিনা!

এমন মোহময় কলকাতা ছেড়ে ছেলেবেলায় আমরা চলে যেতাম বহরমপুরে। সে এক অন্য আনন্দ। বিচিত্র সব বাসের নাম। দল বেঁধে মজা করতে করতে মামাবাড়ি যাওয়ার দৃশ্যগুলো পুজো এলেই আমার স্মৃতিতে ভীষণ ভাবে ফিরে আসে। হরিহরপাড়ায় আমার মামার বাড়ি। লক্ষ্মীপুজো ওখানে কাটিয়ে কালীপুজোর আগে ফিরে আসতাম আমার নিজের শহর কলকাতায়। এখন সে সব যেন জীবন থেকে উবে গেছে, হারিয়ে গেছে।

পুজো এলে আমার স্মৃতি, বোধ

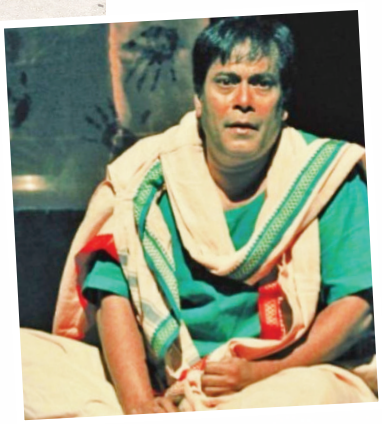

এমন অনেক হারিয়ে ফেলাকে খুঁজে বেড়ায়। কত বন্ধু ছিল, যারা আজ আর এই পৃথিবীতেই নেই অথবা প্রবাসে। টুটু নামে আমাদের পাড়ার এক বন্ধুর কথা বলি। স্কুলের খাতায় ওর নাম ছিল ইন্দ্রনীল সিনহা। ওদের পুরো পরিবারটাই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। কেউ আর বেঁচে নেই। ওর কথা, ওদের কথা মনে পড়লে মনটা কেমন যেন হু-হু করে। আনমনা লাগে! টুটু প্রবল ভাবে শচীন দেব বর্মন, রাহুল দেব বর্মনের অনুরাগী ছিল। পুজোর দিনগুলোতে মাইকে প্রথম যে আর ডি বা এস ডি-র গান বাজত, সেই গান পুটুদের বাড়ি থেকেই ভেসে আসত।

পুজো, অনেকের মতো আমার জীবনেও সেভাবে ছুটি নিয়ে আসে না। বরং ছোটাছুটি বেড়ে যায় নাটকের সুবাদে। তবে একেবারেই যে অ-সামাজিক হয়ে উঠি তেমনটা নয়, চেষ্টা করি পুজোর দু-একটা দিন কাজ থেকে একটু দূরে থাকতে। চেষ্টা করি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পুজোর দিনগুলোতে দেখা করতে, আড্ডা দিতে, একটু জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করতে। বাদ যায় না ঠাকুর দেখাও। এখন তো আবার পুজোকে ঘিরে নানারকম প্রতিযোগিতা। বিচারক হিসাবে নাম জুড়ে গেলে এমনিতেই বহু পুজো প্যান্ডেলে যেতে হয়। পুজো দেখা হয়ে যায় বিচারকের তকমা এঁটে। সোদপুরে আমাদের একটা পারিবারিক পুজো হয়। সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করি। আসলে শরতের অনুষঙ্গে এমন কিছু প্রকৃতিতে জুড়ে থাকে, যা আমার মনন-মগজ জুড়ে শিকড় ছড়ায়। এগুলো আসলে চিরকালীন। নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, শিউলির সুবাস, কাশের দোলা, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার কাঁই-নানা এবং আরও কত কি!

এর মাঝেও বদল ঘটে গিয়েছে। আগে সেই হতদরিদ্র জীবনে এক-ছিটের কাপড় থেকে ভাই-বোন সবার পুজোর পোশাক হত। পুজোর সময় যেন জার্সি গায়ে বেরিয়ে পড়ত হালদার বাড়ির টিম। আজকের দিনে নতুন প্রজন্ম সেসব ভাবতেই পারবে না। আগে পুজোর আনন্দ আমাদের গুরুজনদের ইচ্ছে-মর্জি-দানে অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল, এখন নিজের ইচ্ছেমতো, রুচিমতো নিজেদের জামাকাপড় কিনতে পারি, কিন্তু নিজের জন্য পছন্দ করে জামাকাপড় কেনার ইচ্ছেটা এখন আর হয় না। শৈশবের অ-প্রাপ্তিগুলোর সুখগুলো এখন সত্যিই 'মিস' করি। আর পাই না।

অতি উত্তম

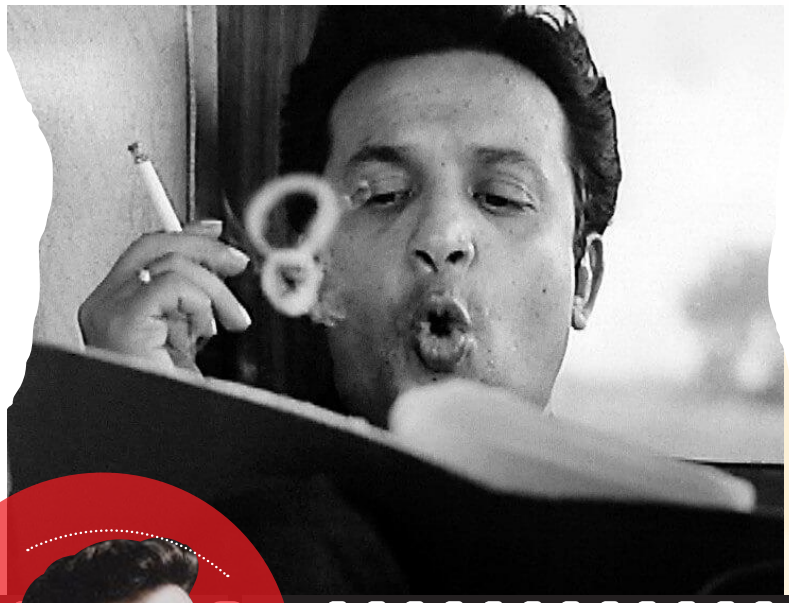

যদিও বিশ্বায়নের পর থেকেই বাঙালি জাতি তার স্বকিয়তা অনেকাংশেই ঝেড়েঝুড়ে ফেলেছে। অন্যের আদবকায়দা খানাপিনা বলন চলনের প্রতি টান তাদের চিরকালের। পাড়ায় পঞ্চাশ দশকের অধিক কাল ধরে বসবাসকারী রিকশাা–কাকার সঙ্গে অদ্ভুত হিন্দিতে কথা বলে তার নিজের ভাষা ভুলিয়ে ছেড়েছেন বহু বঙ্গ সন্তান। আমি হলফ করে বলতে পারি, চাইনিজ মোগলাই ও দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের দোকান, এই বাংলার শহর মফস্‌সল জুড়ে যেভাবে গজিয়ে উঠেছে তা তাদের নিজভূমে আছে কিনা সন্দেহ। পোশাকের দিক থেকেও বাঙালি জাতি অনুষ্ঠানের উদযাপন ছাড়া সকল সময় সাগরপারে পড়ে আছে। শুধু কিছু বিষয়ে তাদের বাঙালিত্বের নাড়ি বহু গভীরে শক্তপোক্ত ভাবে রয়েছে, হাজার নড়নচড়নেও তাকে নড়ানো যাবে না।

বছরের প্রথমে নিয়ম

বিশ্বনাথ বসু

জন্ম গ্রামে, বর্ধমানে। কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে প্রায় আড়াই দশকজুড়ে রুপোলি পর্দায়। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রথম সারির বিভিন্ন দৈনিক সহ লিটল ম্যাগাজিন, দেশ–দুনিয়ার পত্রপত্রিকায় নিয়মিত সচল কলম। মনের টানে আনন্দ ভ্রমণে আর গ্রামের বাড়িতে টইটই।

করে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ফেবুতে ছবি দেওয়া, দুপুরে ভাত ডাল চিংড়ি এঁচোড় খেতে রেস্টুরেন্টের ওয়েটিং লিস্টিতে নাম লেখানো। দুর্গাপূজার কেনাকাটার হিড়িক দূরের মানুষকে কাছে টেনে নেয়, বাড়ির পরিচারিকার মেয়েটিও নতুন বস্ত্র পায়। ভাইফোঁটার ফোঁটার অনেকটাই ট্যাব ল্যাপটপের আওতায়। বারোমাসের তেরো পার্বণ কোথাও জ্বলজ্বলে আবার কোথাও টিমটিমে, তবে সব ছাপিয়ে বাঙালি জীবনে নেমে এসেছে থার্টি-ফার্স্টের রাত থেকে হ্যাপ্পি নিউ ইয়ারের সকাল যা চলতেই থাকে। ভিন্নদেশি প্রভাব প্রভাবশালী হয়ে বঙ্গ জীবনে ছায়াপাত করলেও, একটি বিশ্বাসের ওপর ছায়ার বিন্দুমাত্র ছায়াপাত পড়েনি। আর তা হল উত্তম...

সারা দেশে ও দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনের নাম উত্তম কুমার। তাই হাজার ঘোমটার আবডালে থাকা এই বঙ্গের বুড়ি থেকে ছুড়ি ১৯৮০ সালের ৪ঠা জুলাই কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছেছিল। কি তার চাহনি, কি তার হাঁটা, কি তার মাতৃভক্তি, কি তার প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ আদর মাখা সংলাপ আবার খলনায়ক হিসাবে বাঘবন্দি খেলা-য় তিনি একাই একশো। তবে আমার মতো বাংলা সিনেমার লিলিপুট কমেডিয়ানের কাছে তাঁর রসবোধ কালজয়ী।

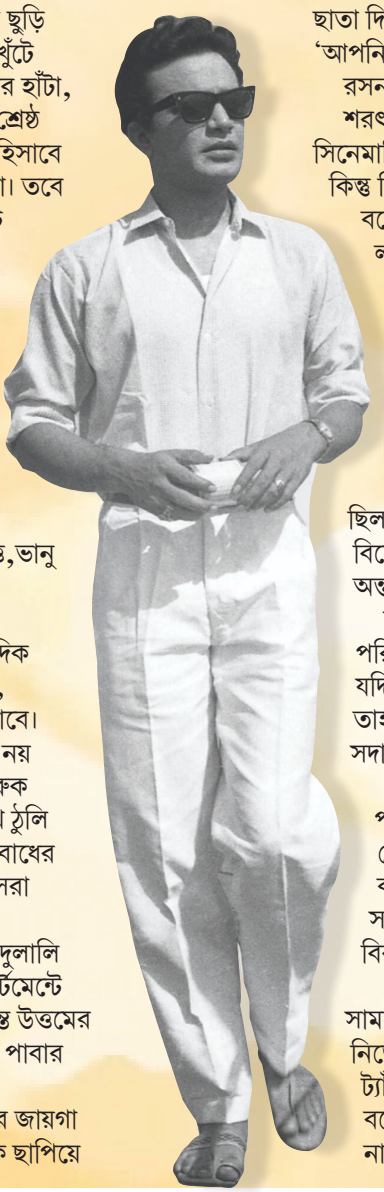

ছোটবেলায় যখন বাবার হাত ধরে আস্তে আস্তে বাংলা সিনেমার গুণগ্রাহী হয়ে উঠছি, সেই সময় আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল বাংলা অভিনেতাদের রসবোধ।আর সেখানে উত্তম-সুচিত্রা উত্তম-সুপ্রিয়া উত্তম-সাবিত্রী উত্তম-মাধবীর পাশে রয়েছেন তুলশী চক্কোত্তি,ভানু বাড়ুজ্জে, জহর রায়, হরিধন, নৃপতি, নবদ্বীপ, মলিনাদেবী রাজলক্ষী দেবী আরো বাঘা-বাঘারা। এদিক থেকে ওদিক হয়েছে কি একেবারে হাতে হ্যারিকেন, তাতে আবার তেল নেই অবস্থা হয়ে যাবে। তবে না, গুরু আমার সে পাত্রের মাল নয় কারণ বাঙালি আর যাই পারুক না পারুক শিল্পীর শিল্পত্ব বিচারে একেবারে চোখে ঠুলি ও ন্যায়দণ্ড হাতে। সেই বাঙালির রসবোধের চাওয়া পাওয়া-র হিসাব সর্বকালের সেরা নায়ক মিটিয়েছেন যত্ন সহকারে।

'চাওয়া পাওয়ায়' যখন ধনী ঘরের দুলালি সুচিত্রা সেন, রাতের জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠে বলে ওঠেন— 'শুনছেন?' ঘুমন্ত উত্তমের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না তা জায়গা পাবার নামান্তর।

বলে ওঠেন— 'শুনলেও কি সরার জায়গা আছে।' নায়িকার আসন্ন কষ্টের রাতকে ছাপিয়ে দর্শকের মুখ ফিক করে ওঠে।

'শুন বরনারী' সিনেমায় পকেটমারি হয়ে যাওয়া সুপ্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে যান নায়ক, সেখানে ভাড়া মিটিয়ে দিতে গেলে আশেপাশের সকলের টিপ্পনীর জবাব একটু অন্য ধারায় বইলেও, সহজ সাধারণ বলা কথাগুলো দর্শক মনকে খিলখিলিয়ে তোলে।

'অগ্নীশ্বর' যখন প্রেস্ক্রাইব করা ডাক্তারের ডোজ পূর্বের ডাক্তার কমিয়ে দেন, তখন অগ্নীশ্বররূপী মহানায়ক বলে ওঠেন— 'আপনাকে যদি ঠাসঠাস করে চারটি চড় মারার দরকার হয়, সেখানে কি দুটো মারলে চলবে?'

'নায়িকার সংবাদ' সিনেমায় নৃপতি চট্টোপাধ্যায় লুকিয়ে পাঁচিল টপকে অঞ্জনা ভৌমিককে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই নায়ক উত্তম কুমার তাঁকে তাঁরই ছাতা দিয়ে খোঁচা দেন। প্রত্যুত্তরে নৃপতি বলেন — 'আপনি কি আমায় মারবেন?'

রসনায়ক বলে ওঠেন— 'ঠিক করিনি তবে ভাবছি।'

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' অবলম্বনে 'সব্যসাচী' সিনেমাটি মহানায়কের জীবনে অন্যতম সিরিয়াস ছবি কিন্তু গিরিশ মহাপাত্র নামে ছদ্মবেশী মানুষটি যখন বলেন, তিনি নিজে গাঁজা না খেলেও অন্যের যদি লাগে তাই তিনি নিজের কাছে কল্কেখানি রেখে দেন। তখন গম্ভীর রসও একটু শিথিল হয়।

'শুধু একটি বছর' ছবিতে, বিবাহকালের মধ্যিখানের একটা বছরের অধিকাংশ সময় এক সদ্য বিবাহিত রসবাণ পুরুষের ন্যায় হাসি-মশকরা করে কাটিয়ে দেন আমাদের নায়ক। তাঁর হৃদয়ে যে বিচ্ছেদের ছেঁকা লাগছিল না তা নয়, তবে তাঁর উচ্ছলতার দমকা হাওয়ায় ঢাকা ছিল। অনাবিল আনন্দধারার পাশে থাকার পরিণতি, বিচ্ছেদের আসন্ন সময়ে ব্যথার আগুনে নায়িকার অন্তর জ্বলে ওঠে।

যদিও সকল সংলাপ চিত্রনাট্যকারের কারসাজি, পরিচালকের সুনির্দেশনার বুনন, তবুও তার সঙ্গে যদি মহান অভিনেতার রসবোধ মিলেমিশে না যেত, তাহলে আজ অর্ধশতাব্দী পরেও আমাদের মনে সদা-ভাস্বর হয়ে থাকত না।

'নায়ক' সিনেমায় শর্মিলা ঠাকুরকে ডেকে পাঠানোর সময় ব্লাউজে পেনের অবস্থান দুবারে বোঝাতে গিয়ে যে সন্তর্পণ ভাব অবলম্বন করেছেন তাতে শিক্ষিত সমাজের ঠোঁটের কোণায় সর্বসমক্ষে চিড় না ধরলেও মন-মস্তিস্কে হাস্যরস বিরাজ করে।

'দেয়ানেয়া' চলচ্চিত্রে, যখন পাহাড়ি সান্যালের সামনে এবং তাঁর একমাত্র সুন্দরী নাতনির সামনে নিজের নাম গৌরহরি ও তার দুই সন্তানের নাম ট্যাঁপাটেপি এবং তার স্ত্রীর নাম ট্যাঁপাটেপির মা বলেন--তখন দর্শকের চেয়ার না নড়ে উঠে পারে না। বন্ধু তরুণ কুমার বন্ধুর স্ত্রী লিলি চক্রবর্তীর

সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়ার মুহূর্তে সংগীত শিল্পী জয়ন্ত অনুরাগী সুন্দরী তনুজা উপস্থিত হয়, মহানায়কের তাৎক্ষণিক শারীরিক অভিনয় কে-বা ভুলতে পারে।

তবে আমার ব্যক্তি পছন্দের সবচেয়ে প্রিয় হাসির ছবি 'ছদ্মবেশী', তবে এর জন্য অবশ্যই গল্পখানা সিংহভাগ দায়ী। তবে উত্তম কুমারের রসের রিক্টার স্কেল সর্বোচ্চ মাত্রা ছোঁয়। 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছ?' রাশভারী বিকাশ রায় প্রশ্ন করেন, উত্তরে আসে—'আজ্ঞে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু করিনি, আমি এসে এসে দাঁড়িয়েছি'।

বিকালে মাধবী ও তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় মাধবীর নিকটে আসার ইচ্ছায়, বাংলা চলচ্চিত্রের বড়বাবু বলে ওঠেন বাচ্চা মেয়েটির উদ্দেশ্যে —'উহারা অতিশয় চতুর', সঙ্গে আরও কিছু কথা। যা মনে পড়লে গোমড়া মুখেও হাসি ফুটবে।

'আমি কোনপথে যে চলি আর কোনকথা যে বলি' গানে অনবদ্য স্বকীয়তা আমাদের রসভাণ্ডারকে পূর্ণতা দেয়।

গানের কথাই যখন উঠল তখন 'সপ্তপদী'র 'এবার কালী তোমায় খাব'র সঙ্গে ইংরেজি গানের যুগলবন্দি শ্রীখোল সহযোগে এবং জয়লাভ এক মধুর রসের মেলবন্ধন। আর হঠাৎ ওথেলো চরিত্র পাওয়া নিপাট বমকে যাওয়া উত্তম কুমারকে রীনা ব্রাউন বলে ওঠে —'ও আমাকে টাচ করতে পারবে না'। সাধারণ বাঙালি ঘরের সচরাচর নারীর স্পর্শ না পাওয়া, মুখে ভুষোকালি মাখা কৃষ্ণেন্দু অসহায় ভাবে বলে ওঠে—'না ছুঁলে পাঠ করব কী করে?' সেই মুখ রসসিক্ত করেছে কাল কাল ধরে।

'দুই ভাই' ছবিতে বেশ হাল্কা রসের ছোঁয়া রয়েছে বিশেষত পায়রা নিয়ে গানখানার মধ্যে।

'চাঁপাডাঙার বৌ' সিনেমার মধ্যে উত্তমের তারুণ্য রসখানি বেশ জাজ্বল্যমান।

আর আপাদমস্তক হাসির ছবির মধ্যে 'মৌচাক', 'ধন্যি মেয়ে' সর্বজনীন। 'ধন্যি মেয়ে'তে গোল বলে নিজের ঘুমন্ত স্ত্রীর পায়ে শট মারার দৃশ্যে আপামর বাঙালি খানখান। এমনকি অভিনয় জীবনের শেষের দিকে 'অমানুষ' ছবি সিরিয়াস সিনেমা হলেও বঞ্চিত জমিদার মদ্যপ মধু চৌধুরির বেশকিছু মজার দৃশ্য রয়েছে।

আর জীবনের সাঁজেরবেলার 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবিতে স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি-মাখা অভিনয় আমাদের কাছ থেকে তাকে সশরীরে সরালেও অনুপস্থিত করতে পারেনি। দু-পাত্র মুখে ঢালতেই রসিক বাঙালি গেয়ে ওঠে, 'এই তো জীবন, যাক না যেদিকে যাক প্রাণ' কিংবা হাল্কা কোন ক্ষণে বউ বা বান্ধবীর চিবুক ধরে আজও কেউ গেয়ে ওঠে, 'লোলা লুলু কেন তোমার বয়স হয় না ষোলো/ আমার নাইন্টিন'।

বাঙালির বাঙালিত্বের মাপকাঠি যতই এদিক ওদিক হোক বা ভিনদেশি প্রলেপ পড়ুক, বাঙালি রসগোল্লার রসে টইটুম্বুর ছিল আছে থাকবে। যেমনটি বাংলা সিনেমা উত্তম রসে রসোত্তম ছিল আছে থাকবে।

Best compliments from

Prints and Weaves by Ronita

ওঁ ভগবতী ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নী চ কামদে।
কৌশিকি ত্বং মহেশানি কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
যিনি স্বয়ং ভগবতী, যিনি আমাদের সকলের মনের ভয় দূর করেন, যিনি কাত্যায়নী, যিনি মনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই ইন্দ্রাণী পরমেশ্বরী কালিকাকে প্রণাম করি।

1832
Diwali Delight
FREE*
GOLD COIN
or
GIFT ON JEWELRY
PURCHASE ABOVE $500
PNG
JEWELERS
PASS ON HAPPINESS
SPECIAL HOURS FOR DIWALI
NOVEMBER 10 (DHANTERAS): 10 AM TO 10 PM
NOVEMBER 12 (DIWALI): 11 AM TO 5 PM
NOVEMBER 11, 13, 14 & 15 : 11 AM TO 8 PM
Now Purchase Your Jewelry
From Anywhere In USA
On Facetime / Videocall,
Contact Us : 408-245-6764
PNG Jewelers, 791 E El Camino Real, Sunnyvale CA 94087 | http://www.pngjewelers.com

আনন্দ

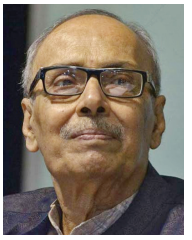

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার চেয়ে বয়সে বছর বারো বড়। জন্ম ময়মনসিংহে। পিতার কর্মসূত্রে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসমে কেটেছে ছেলেবেলা। প্রথম গল্প জলতরঙ্গ। প্রথম উপন্যাস ঘুণপোকা। আত্মিক সংকট কাটিয়ে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে বটবৃক্ষ হয়ে ওঠা। সাহিত্য একাডেমি, আনন্দ সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত।

রাত সাড়ে বারোটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যে স্টেশনে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল, সেটা ইউ পি–র একটি অত্যন্ত অখ্যাত জায়গা। স্টেশনটা নিতান্ত ছোট। হাড় হিম করা ঠান্ডায় আর নিরেট অন্ধকারে টিমটিমে বিজলি বাতির আলোয় স্টেশনটি যেন নিজেই নিজেকে হারিয়ে বসে আছে। কি ঘন কুয়াশা চারদিকে!

অরিন্দম তার ব্যাগটা নিয়ে নেমে একটু দিশাহারা বোধ করছিল। এত রাতে মনোহরবাবুর বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা বৃথা। জায়গাটা ছোট হবে, কিন্তু এই ঘুমন্ত গঞ্জে সে বাড়ি খুঁজে পাবে কী করে?

স্টেশনটায় একটি বুকিং অফিস এবং স্টেশন মাস্টারের ঘর আছে। আর বুকিং অফিসের লাগোয়া একটা অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় চারখানা বেঞ্চ। এইটেই বোধহয় ওয়েটিং রুম। চারটে বেঞ্চেই গোটাকয়েক লোক গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। মেঝেতেও চট পেতে জনা দুই। এই চাষাড়ে ঠান্ডায় তারা মুণ্ডুসুদ্ধু ঢেকে রেখেছে যথাসম্ভব।

অরিন্দম একটা বেঞ্চে একটুখানি জায়গা পেয়ে ব্যাগটা রাখল। তারপর গিয়ে উঁকি দিল বুকিং কাউন্টারে। ভিতরে একজন লোক মাথা নীচু করে বোধহয় হিসেব–টিসেব করছিল। তার মাথা–মুখ বাঁদুরে টুপিতে ঢাকা।

ভাইসাব, আপ ক্যা মনোহর ঘোষ সাহাবকো পহচানতে হেঁ?

লোকটা তার দিকে চেয়ে নম্রভাবেই বলল, জি।

মুঝকো মনোহরবাবুকা কোঠি যানা হ্যায়।

ইতনি রাত মে?

দূর হ্যায় ক্যা?

কম সে কম এক মাইল তো হোগা!

অরিন্দম দমে গেল। অচেনা জায়গায় মধ্যরাতে ভারী একটা ব্যাগ টেনে এক মাইল হাঁটা কষ্টকরও বটে, বিপজ্জনকও। কারণ পথে কুকুর ধরতে পারে, চোর সন্দেহ করে লোকে হামলা করতে পারে।

আপ জারা বৈঠ যাইয়ে। সবেরমে যাইয়েগা। রাস্তা খারাপ হ্যায়।

অরিন্দমের আরও একটা সমস্যা হল, তার সঙ্গে কোনও খাবার নেই। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল কোথাও কোনও দোকান-টোকান দেখা যায় কিনা। না, ঘন কুয়াশায় সেরকম কিছু দেখা গেল না। দোকান থাকলেও এত রাতে দূর মফস্‌সলে কে দোকান খোলা রাখবে?

খিদের সঙ্গে যোগ হয়েছে ঠান্ডা। এত ঠান্ডা সহ্য করার অভ্যাস নেই তার। প্রায় খোলা চাতালে যে লোকগুলো অকাতরে ঘুমোচ্ছে তারা নিতান্তই গরিব মানুষ, গায়ে চাপা দিয়েছে ছেঁড়া কম্বল বা কাঁথাকানির মতো জিনিস। এই প্রচণ্ড শীতে তাতে আটকানোর কথা নয়। এ দেশের গরিবদের সহ্যশক্তি অপরিসীম।

মনোহর ঘোষকে সে চেনে না। বেঞ্চে বসে সে মনোহর ঘোষ নামক রহস্যময় লোকটার কথা ভাবছিল। মনোহর ঘোষ এক ভাগ্যান্বেষী মানুষ, বাঙালি হলেও বাংলার লোক নন। এলাহাবাদে জন্ম। এমএ এবং ল পাশ। একসময়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। প্রবাসী এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, সুখী মানুষ। তারপর হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী মারা যান। সেই থেকে বৈরাগ্য। এলাহাবাদের বিরাট পৈতৃক বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি হেলায় ফেলে রেখে এই গ্রামে চলে এসেছেন। বহুকাল তাঁর কোনও খবর ছিল না। তাঁর এক বন্ধু তাঁর বিষয়সম্পত্তি আগলে রেখেছেন। প্রকৃত ওয়ারিশনের সন্ধান পেলে হস্তান্তর করবেন। মনোহর ঘোষকে লোকে ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ এলাহাবাদের একটি ইংরেজি কাগজে একটা খবর বেরোল যে, মনোহর ঘোষের নবজন্ম ঘটেছে। তিনি গত কয়েক বছর ধরে অসাধারণ কিছু ছবি এঁকেছেন।

শুধু এটাই খবর নয়, দিল্লির এক পাঁচতারা হোটেলে মনোহরের একশো বাইশখানা ছবির একটা এগজিবিশন হয়। তাতে প্রত্যেকটা ছবিই ভালো দামে বিক্রি হয়ে যায়। আর্ট ক্রিটিকরা তাঁর ছবির ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। অরিন্দম এলাহাবাদের একটি ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিক। এডিটর তাকে একদিন ডেকে বললেন, মনোহর ঘোষের পাত্তা লাগাও, নইলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

পাত্তা লাগানো বড় সহজ ছিল না। প্রথম কথা দিল্লিতে প্রদর্শনী হলেও মনোহর সেখানে যাননি। প্রদর্শনীর আয়োজকরা মনোহরের হাল হকিকত জানাতে নারাজ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং গোয়েন্দাগিরি করে এই এত দূর আসা। অরিন্দম ঝানু সাংবাদিক নয়। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সী অত্যুৎসাহী যুবামাত্র। মনোহর ঘোষকে আবিষ্কার করতে এসেছে।

অরিন্দম ঘড়ি দেখল। রাত একটা পাঁচ। বুকিং ক্লার্ক ঝাঁক বন্ধ করে দিয়েছে। বোধহয় অফিসে ঘুমানোর বন্দোবস্ত আছে। একখানা লোমওয়ালা বিছানার জন্য শরীরটা আঁকপাঁক করছে অরিন্দমের। আর খিদেটা পেট থেকে ব্রহ্মতালু অবধি বিস্তার লাভ করেছে।

এক বন্ধু তাঁর বিষয়সম্পত্তি আগলে রেখেছেন। প্রকৃত ওয়ারিশনের সন্ধান পেলে হস্তান্তর করবেন। মনোহর ঘোষকে লোকে ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ এলাহাবাদের একটি ইংরেজি কাগজে একটা খবর বেরোল যে, মনোহর ঘোষের নবজন্ম ঘটেছে।

খাবার না থাকলেও জলের বোতল আছে ব্যাগে। খিদে মারতে বোতল বের করে জল খেতে গিয়ে দেখল, জল এত ঠান্ডা মেরে গেছে যে, গলায় যেন ছুরি চালানোর মতো লাগছে। অগত্যা ক্ষান্ত দিল সে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কি আর করতে পারে সে!

অরিন্দমের ঢুলুনি এল। বসা অবস্থাতেই ঘাড়টা ভেতরে করে চোখ বুজে ফেলল সে। তারপর হিজিবিজি স্বপ্ন। কিন্তু খিদে আর ঠান্ডায় ঘুমটারও বারবার চটকা ভেঙে যাচ্ছে। এলাহাবাদ থেকে ট্রেনটা অস্বাভাবিক দেরি না করলে তার আজ বিকেলেই পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। জংশন স্টেশন থেকে গাড়ি বদলে প্যাসেঞ্জার ট্রেন পেতেও ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকতে হল। সময়মতো ট্রেন পেলে সে কাজ সেরে এতক্ষণে ফেরার ট্রেনে চেপে বসে থাকতে পারত। এদেশে কি ইচ্ছেমতো সব হয়?

রাত দেড়টায় হঠাৎ চারদিক প্রকম্পিত করে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনই হবে। নিশ্চয় প্রচুর লেট করে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেন থেকে জনা দশ-বারো লোকও নামল।

বেশিরভাগই দেহাতি গরিব মানুষ। শীতে জবুথবু। কিন্তু তারা ছাড়াও জনা চারেক মেয়ে-পুরুষ। দুজনের গরম পাতলুন, প্রিন্স কোট, মাথায় কাশ্মীরি টুপি, দুই মহিলার গায়েও মহার্ঘ্য কোট, স্কার্ফ, শাড়ি এবং চুড়িদার।

ভারি অবাক হয়ে চেয়েছিল অরিন্দম। এরা এত রাতে এই গাঁ-গঞ্জে কোথায় যাবে!

তাকে ভারি অবাক করে দিয়ে প্রৌঢ় পুরুষটি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, দেখেছ, ভোলা গাড়ি নিয়ে আসেনি।

বয়স্ক মহিলা বললেন, খবর পেয়েছে কিনা দেখো। এখন কী হবে?

পুরুষটি বিরক্ত হয়ে বললেন, কি আর হবে! কাছেই বীরেন সিং-এর বাড়ি, ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে আর কি!

অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দুটি কোনও কথা কইল না। মুখে বিরক্তির ভাব।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, মুংলি, কী বলিস?

মেয়েটা ভারি মিঠে গলায় বলল, বীরেনচাচার মুশকিল কী জানো?

রে?

হুজুর, টায়ার পাংচার হুয়া থা।

ওরা যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে তখন একটা চকিত তাগিদে অরিন্দম উঠে গিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এখানে মনোহর ঘোষের বাড়িটা কোথায় তা জানেন?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, বাঙালি নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অরিন্দম মিত্র। এলাহাবাদ থেকে এসেছি। রিপোর্টার।

তা এত রাতে কেন?

ট্রেনটা লেট ছিল, তাই ফেঁসে গেছি।

স্টেশনে বসে রাত কাটাবেন নাকি? মনোহর ঘোষের বাড়ি অনেক দূর। সাতপুরা ছাড়িয়ে জঙ্গলগড়ের রাস্তায়।

সকালে রিকশা-টিকশা পাওয়া যাবে না?

তা যাবে। মনোহর ঘোষের কাছে কেন? কোনও খবরের জন্য?

হ্যাঁ, উনি তো এখন খুব বিখ্যাত লোক। তাই একটা ইন্টারভিউ নিতে আসা।

ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে কি যেন দেখছিল! হঠাৎ ফিরে বলল, বাবা, কি যেন একটা আসছে! গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। ওই যে! সাতপুরার মোড় থেকে টার্ন নিল বলে মনে হয়।

--এই কুয়াশায় দেখছিস কী করে? আমি তো দেখছি না।

একবার আমাদের পেলে কাল সারাদিন আটকে রাখবে। কিছুতেই যেতে দেবে না।

ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে কি যেন দেখছিল! হঠাৎ ফিরে বলল, বাবা, কি যেন একটা আসছে! গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। ওই যে! সাতপুরার মোড় থেকে টার্ন নিল বলে মনে হয়।

এই কুয়াশায় দেখছিস কী করে? আমি তো দেখছি না।

আমি পাচ্ছি বাবা, দুটো হেডলাইট খুব আবছা দেখা যাচ্ছে।

এলে তো ভালোই। মিনিট পাঁচেক দেখা যাক।

অরিন্দমের খুব লোভ হচ্ছিল, এদের সঙ্গে কথা বলার। তবে চেহারা আর হাবভাব দেখে মনে হয়, এরা রাইস লোক। বড়লোকেরা উটকো অচেনা লোককে পছন্দ করে না। গাল বাড়িয়ে থাপ্পড় খাওয়ার মানে হয় না।

পরিবারটা একধারে দাঁড়িয়ে খুব উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে রইল। একটু বাদে একটা বিরাট ঝকঝকে গাড়ি এসে ঘ্যাঁচ করে থামল সামনে। উর্দিপরা ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে এসে সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, দের কিয়া কিউ

এই শীতে ঠান্ডায় স্টেশনে বসে থাকবেন কেন, বরং আমার বাড়িতে চলুন। রাতটা কাটিয়ে সকালে ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে যাবেন। আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরও নয়। আসুন, উঠে পড়ুন।

আমি আপনাদের অসুবিধেয় ফেলছি না তো?

না, অসুবিধে কীসের? তার ওপর আপনি বাঙালি, দেশের মানুষ। উঠুন।

অগত্যা গাড়িতে উঠে পড়ল অরিন্দম। সামনের সিটে, ভদ্রলোক এবং ড্রাইভারের মধ্যবর্তী জায়গায়। গাড়িটা পুরোনো আমলের বুইক বা ওই জাতীয় বড় গাড়ি। ভারি আরাম বসে।

কথায় কথায় জানা গেল, ভদ্রলোকের বিরাট কাঠের কারবার আছে এখানে। ডিজাইনার ফার্নিচার তৈরির বড় বড় কন্ট্রাক্ট পান। এখানেই তাঁর কারবার। তবে এলাহাবাদ আর লখনউতে শোরুম আছে। দিল্লিতেও শিগগিরই খুলবেন। নাম অনিমেষ রায়।

দশ মিনিট পরে যখন অনিমেষ রায়ের বাড়ি পৌঁছোল তখন হকচকিয়ে গেল অরিন্দম।

অন্ধকার এবং কুয়াশার মধ্যে বাড়িটা যেন জাহাজের মতো প্রতিভাত হচ্ছে। চারদিকে বিশাল

বাগান, মাঝখানে বিরাট বাড়ি। বিজলি বাতির বহর দেখে অরিন্দম অনুমান করল, ডায়নামো চলছে। নইলে এই দূর প্রান্তে বিজলিবাতির এত বাড়াবাড়ি সম্ভব নয়। ভদ্রলোক আলাপি আর মিশুকে হলে কী হবে, অনিমেষ রায়ের বউ বা ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। গাড়ি থেকে নেমে চটপট ভিতরে, বোধহয় যে যার ঘরে চলে গেল।

অনিমেষের মেলা চাকরবাকর এসে মালপত্র নামাচ্ছিল। তাদেরই একজনকে ডেকে অনিমেষ বললেন, সাবকো গেস্ট রুমমে লে যাও।

একতলায় বেশ সাজানো-গোছানো একটা ঘরে চাকর তাকে পৌঁছে দিল। বিরাট ঘর। বিছানার ঢাকনাটা তুলে চাকরটাই বালিশ-লেপ সব বের করে চটপট সাজিয়ে দিল। বলল, কুছ চাইয়ে সাব?

অরিন্দম খিদেয় কাহিল। সসংকোচে বলল, একঠো রোটি মিলেগা?

চাকরটা হেসে ফেলল, একঠো কিউ বাবু? খানা লাগা দেতা হ্যায়। কোই দিক্কত নহি।

জ্যাদা কুছ নেহি চাহিয়ে।

আরাম কিজিয়ে, তুরন্ত খানা লাতা হ্যায়।

এত আরাম কল্পনাও করেনি অরিন্দম। গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখে গরম তরকারি, ডাল, রুটি নিয়ে চাকর হাজির।

খেয়ে লেপের তলায় ঢুকতেই ঘুম।

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ শুয়েছে, দেরিতে ঘুম ভাঙবার কথা, কিন্তু অরিন্দম সকাল সাড়ে ছ'টাতেই উঠে পড়ল। কুয়াশা খানিকটা এখনও জমে আছে বটে, কিন্তু জানালা দিয়ে রাঙা রোদের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। অচেনা বাড়িতে রাতটা কেটেছে মন্দ নয়। বাড়ির মালিককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়া দরকার। আজই এলাহাবাদ ফিরতে হবে। তাছাড়া অনিমেষ রায় তাকে শীত ও খিদে থেকে রক্ষা করলেও তাঁর পরিবার-পরিজনরা তাকে যে মোটেই আমল দেয়নি, সেই অপমানটাও সে ভুলতে পারছে না। হয়তো ওঁরা খুব অহংকারী!

মুখটুখ ধুয়ে সে যখন পোশাক পরতে যাচ্ছিল তখনই রাতের সেই চাকরটি চা নিয়ে এল, মুখে একগাল হাসি। অবাক হয়ে বলল, কাঁহা যা রহেঁ হে সাহাব?

তুমকো নাম ক্যা হ্যায়?

রামুয়া জি।

রামুয়া, ম্যায় কাম পর যা রহা হ্যায়।

যাইয়ে গা সাহাব। নাস্তা তো লে লিজিয়ে।

নাস্তা! একটু ভাবল অরিন্দম। না, ব্রেকফাস্টের দরকার তার নেই। কাজটা সেরে দোকান-টোকানে কিছু খেয়ে নেবে। দেহাতে আর কিছু পাওয়া না

প্রচণ্ডে পুত্রদে দেবি সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কুলোদ্যতকরে চোগ্রে পার্বতী ত্বং প্রসীদ মে॥
হে ভয়ঙ্করী, পূত্রদায়িনী, হৃষ্টা, সুরশ্রেষ্ঠা, তুমি বংশকে উজ্জ্বল করে থাকো — হে উগ্রা, পার্বতী, তুমি দয়া করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

গেলেও দই-চিড়ের অভাব হবে না। নয়তো ছাতু।

দেরি হয়ে যাবে বলে সে আপত্তি তুলতেই রামুয়া বলল, মেমসাহাব নে বোলা, আট বাজে আপকো অন্দর লে যানে হোগা।

একটু অবাক লাগল অরিন্দমের। মেমসাহেব মানে তো অনিমেষ রায়ের স্ত্রী। তিনি কেন আমন্ত্রণ জানাবেন?

আগুপিছু ভেবে অরিন্দম যাত্রাভঙ্গ করল। সে যতদূর জানে, বেলা তিনটেতে এখান থেকে জংশনে যাওয়ার ট্রেন মিলবে। রাত্রে এলাহাবাদ পৌঁছোতে অসুবিধে নেই।

সে স্নান করে নিল। তারপর রেডি হয়ে বসে রইল। ঠিক আটটায় রামুয়া এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে। বিশাল বাড়ি। নানা মহার্ঘ্য জিনিসে সাজানো একটা হলঘর পেরিয়ে সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে বিশাল ডাইনিং রুম। চারদিকে হিটার ফিট করে রাখায় এ ঘরে ঠান্ডা নেই। ডাইনিং টেবিলে আজ সবাই উপস্থিত। অনিমেষ রায়, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলে।

অনিমেষ রায় বললেন, আসুন অরিন্দমবাবু, রাতে ঘুম হয়েছিল তো!

লাজুক হেসে অরিন্দম বলল, আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আশ্রয়টুকু না পেলে কষ্ট পেতে হত।

আরে, এ তো আমার কর্তব্য। বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাঙালি হয়ে বাঙালিকে দেখব না? সংকোচ করবেন না, বসুন।

আজ সবাই তার দিকে চেয়ে দেখছিল। অরিন্দমের চেহারা ভালো। সে ছ'ফুট লম্বা। ছিপছিপে, ফর্সা এবং সুপুরুষ। একসময়ে সে সিনেমায় নামার কথাও ভাবত। ঘটনাচক্রে হয়ে ওঠেনি।

সে বসার পর আচমকাই ভদ্রমহিলা তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, সতু নামে আপনার কোনও মাসি আছেন, যিনি জব্বলপুরে থাকেন?

অবাক হয়ে অরিন্দম বলল, হ্যাঁ, আমি তো সতু মাসির কাছে প্রায়ই যাই। আপনি মাসিকে চেনেন?

খুব চিনি, সতুদির পাড়াতেই আমার বাপের বাড়ি। আপনাকে দেখেই কাল চেনা চেনা লাগছিল।

মুহূর্তের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। জব্বলপুরের মাসির সূত্রেই ব্যবধান ঘুচে গেল লহমায়। অনুপস্থিত একজন মানুষও কত নতুন সম্পর্ক রচনা করে দিতে পারে।

মুংলি আর মিতুলের সঙ্গেও দিব্যি ভাব হয়ে গেল এবং পরিবারটিকে মোটেই অংহকারী লাগল না আর। সম্বোধনটাও নেমে এল 'তুমি'তে। অনিমেষ রায় আর তাঁর স্ত্রী হয়ে গেলেন মেসোমশাই আর মাসিমা। যে রকমটা হয়ে থাকে আর কি!

মাসিমা বললেন, মনোহরবাবুর কাছ থেকে ঘুরে এস, তারপর দুপুরে এখানেই খাবে। আমাদের গাড়ি করেই যাবে আসবে। তিনটের ট্রেনও ঠিক ধরিয়ে দেব, চিন্তা করো না।

মুংলি বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু আজ আমাদের একটা পিকনিক আছে। আমি সোশ্যাল কিছু কাজ করি। দেহাতি মেয়েদের লেখাপড়া, হাতের কাজ আর ফার্স্ট এইড শেখাই। ওদের নিয়েই আজ পিকনিক।

মিতুল বলল, আমাকে আজই লখনউ যেতে হবে ব্যবসার কাজে।

অরিন্দম বলল, আরে ঠিক আছে। তোমরা যে যেতে চেয়েছ এটাই তো যথেষ্ট।

মাসিমা বললেন, যাও বাবা, ঘুরে এসো। মনোহর ঘোষ খুব খটমটে লোক। সাবধানে কথা কয়ো, একটুতেই ফোঁস করেন।

আজ সবাই তার দিকে চেয়ে দেখছিল। অরিন্দমের চেহারা ভালো। সে ছ'ফুট লম্বা। ছিপছিপে, ফর্সা এবং সুপুরুষ। একসময়ে সে সিনেমায় নামার কথাও ভাবত। ঘটনাচক্রে হয়ে ওঠেনি। সে বসার পর আচমকাই ভদ্রমহিলা তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, সতু নামে আপনার কোনও মাসি আছেন?

মনোহর ঘোষ যে খটোমটো লোক তাতে সন্দেহ নেই। অনিমেষ রায়ের একটা জিপ গাড়িতে সে যখন একটা ছোট জঙ্গল পেরিয়ে মনোহরের বাড়ির সামনে এসে নামল তখন রোদ উঠেছে এবং মনোহর ঘোষ উঠোনে একটা খাটিয়া পেতে রোদ পোয়াচ্ছেন। অবাক হয়ে তাকে দেখে বলে উঠলেন, ক্যায়া মাংতা?

মনোহরের বেশ বয়স হয়েছে, মুখ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন। উঠোনে মুরগি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা ছাগল দাঁড়িয়ে আছে। দেহাতি সংসার যেমন হয়।

আমি এলাহাবাদ থেকে আসছি, রিপোর্টার।

বাঙালি?

হ্যাঁ।

কী চাও?

আপনার পেইন্টিং নিয়ে ইদানিং খুব কথা হচ্ছে।

দূর দূর! ও নিয়ে কথা বলার কী আছে? পেইন্টিং নিজেই নিজের কথা বলবে।

সে তো ঠিকই স্যার। তবে আপনি তো ওরিজিন্যালি পেইন্টার ছিলেন না। তাছাড়া আপনি বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

দেখো বাপু, প্রত্যেকেরই নিজস্ব জীবনযাপনের অধিকার আছে। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা কইতে আমি যাবই বা কেন?

অরিন্দম প্রমাদ গুণে বলল, তা তো ঠিকই, কিন্তু স্যার, আপনার সম্পর্কে যে মানুষের খুব কৌতূহল!

কৌতূহল থাকলেই যে আমাকে তা মেটাতে হবে তার কোনও মানে নেই।

অরিন্দম লাইন পাল্টে বলে, স্যার, আপনি এখন কী পেইন্টিং করছেন যদি একটু বলেন।

দেখ বাপু, আমি ধরাবাঁধা ট্রেনিং নেওয়া আর্টিস্ট নই। যখন যা খুশি আঁকি ইচ্ছামতো। রুটিন করে আঁকি না। ও ব্যাপারে কিছু বলার নেই আমার।

অন্তত যদি একটা মেসেজও দেন।

একটা মেসেজ নেওয়ার জন্য গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছ? বলিহারি তোমাদের হুজুগের।

ওটা আমার গাড়ি নয়। অনিমেষ রায়ের গাড়ি। দয়া করে ধার দিয়েছেন।

অনিমেষ রায়ের নাম শুনে হঠাৎ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন মনোহর, অনিমেষ। ওই লোকটাই তোমাকে পাঠিয়েছে নাকি?

না, আমি কাল রাতে স্টেশনে আটকা পড়েছিলাম। উনি আশ্রয় না দিলে—

গোটা মহালের গাছপালা মুড়িয়ে কাটছে—ও তো একটা ভিলেন। ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

আজ সকালেই শুনছিলাম, উনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে নিলামে কাঠ কেনেন।

তাতে কী? ওকে খুশি করতেই তো ওরা কাঠ কেটে বন সাফ করছে। যার ট্যাঁকে টাকা আছে সে না পারে কী?

স্যার, একটা কথা বলবেন?

কী?

স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনি গৃহত্যাগ করেন। পরে কি আপনি আর বিয়ে করেছেন?

রোখা চোখা ভাবটা হঠাৎ উধাও হল, মনোহর জুলজুলে চোখে তার দিকে চেয়ে বললেন, বউ মরে গিয়ে আমার খুব ভূতের ভয় হত, বুঝলে? ও ভয় আমার চিরদিন। তাই বাড়ি ছেড়ে চলে আসি। এখানে এক বন্ধু ছিল। বিহারি বন্ধু। তার সঙ্গে থাকতাম। বিষয়স্পৃহা ছিল না। বন্ধুটিই জোর করে তার বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়। খেতি-গেরস্তিও দেয়। তবে এলাহাবাদের সম্পত্তিও আমার আছে।

এখন তো আপনি বেশ ধনী মানুষ।

মনোহর পিছন ফিরে কাকে হাঁক মেরে বললেন, দুখুয়া, এক চারপাই তো লাগা দে। বসো বাপু।

একটা বছর বারো-তেরোর ছেলে দৌড়ে এসে একটা চারপাই পেতে দিয়ে গেল। অরিন্দম বসল।

দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভনিবারিণী।
র্বে সর্বার্থদে দেবি ভব ত্বং বরদা মম॥

হে দেবী দুর্গা, তুমি আমাদেরকে সকল দুর্গতি থেকে রক্ষা করো, তুমি সমস্ত অশুভকে দূর করো। তুমিই আমাদের সকলের সর্বস্ব, তুমি আমাদের সকল প্রার্থনা পূরণ করো। হে দেবী তুমি দয়া করে বর দাও।

মনোহর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি অ্যাডভোকেট ছিলাম। বিষয়সম্পত্তিও ছিল বা আছে। কিন্তু মন তাতে ভরেনি। ভিতরটা বড্ড খাঁ–খাঁ ছিল। হঠাৎ একদিন ছবি আঁকা ধরলাম, বুঝলে। হয়তো আঁকার একটা ক্ষমতা ভিতরে ছিল, বুঝতে পারিনি। যে–ই আঁকতে শুরু করলাম অমনি ভিতরের শূন্যতাটা উধাও হল। আনন্দ এল, মনঃসংযোগ এল, তাগিদ এল। গত দশ–পনেরো বছর ধরে শুধু এঁকে যাচ্ছি।

আপনার ছবির প্রচণ্ড প্রশংসা হচ্ছে, জানেন কি?জানি জানি, বিক্রিও হয়েছে মেলা। অনেক টাকাও পেয়েছি। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে।

কীসের ভয়?

যেটা ছিল আমার নিভৃতের আনন্দ সেটা যখন মার্কেটিং–এর খপ্পরে গিয়ে পড়ল তখন আর আনন্দটা থাকবে কি? খ্যাতির লোভ, অর্থের স্পৃহা এসে আনন্দটাকে মাটি করে দেবে। বুঝেছ? আমি এখন খুব দোটানায় আছি।

প্রকৃত শিল্পীর তো এরকমই হওয়ার কথা। কিন্তু আপনি নির্বিকার থাকলে কে কী করবে?

না হে না, নির্বিকার থাকা এত সহজ নয়। হোলি খেলা নিয়ে আমার একটা ছবি কয়েক লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে, ভাবতে পারো? এরকম রাক্ষুসে দাম কেউ দেয়? যাক গে, কী খাবে বলো।

কিছু না। আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি। আপনার স্টুডিওটা কি একটু দেখতে পারি?

হাঃ হাঃ করে হাসলেন মনোহর। বললেন, আমি কি পিকাসো না মাইকেল অ্যাঞ্জেলো? ওই নিম গাছটার তলায়, নয় তো মকাই খেতে, নয় তো ইঁদারার ধারে, যখন যেখানে মন চায়, ইজেল পেতে আঁকতে বসে যাই। স্টুডিও–ফুডিও নেই। গাদাগাদা ছবি পড়ে আছে। কয়েকখানা আমার এক বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল কাকে দেখাবে বলে! তারপর কী থেকে কী যে হয়ে গেল! আমাকে এখন নানা জায়গা থেকে ডাকছে।

যাবেন না?

দূর দূর। এই তো বেশ আছি। ঝুট–ঝামেলা থেকে দূরে, দেহাতে, আপন মনে। আনন্দই সব বুঝলে! আনন্দ যদি মাটি হয় তাহলে কিছু দিয়ে তো আর ফেরানো যায় না। বুঝেছ?

বুঝেছি।

এইসব কথাই গিয়ে লিখো তোমার কাগজে। লিখো, আমি আনন্দে ভরে থাকতে চাই। আর কিছু চাই না।

যে আজ্ঞে, বলে অরিন্দম উঠে পড়ল।

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

সর্বেষাং নাথভূতাসি ত্বমেবেকাকিনী যতঃ।
তস্মান্নমামি দেবেশি প্রসন্না বরদা ভব॥

তুমি একাই সকলের রক্ষা করো, তাই তুমি প্রণম্য। তোমাকে প্রণাম জানাই। হে দেবশ্রেষ্ঠা তুমি দয়া করে প্রসন্ন হয়ে বর দাও।

The Meat CORNER

Best quality in Bay Area
Order online from www.meatcornercalifornia.com
1036 E EL Camino Real, Sunnyvale, CA 94087+1408-931-6469

সম্ভাবনা

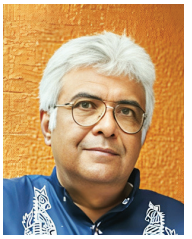

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

দু'দশক ধরে আনন্দবাজার গ্রুপের পত্রপত্রিকা ও রবিবাসরীয়তে নিয়মিত গল্প, উপন্যাস লেখক। মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, প্রেম, রোমাঞ্চকর থেকে নানান সামাজিক সমস্যা ভিত্তিক উপন্যাস তাঁর কলমে। রয়েছে ৮টি বিভিন্ন ধারার ছোটগল্পের সংকলন। প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুকিশোরদের জন্য গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। কিছু ছোটগল্প মারাঠি, তামিলে অনূদিত হয়েছে।

আচমকা অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার জীবন থেকে তিন ঘণ্টা মুছে গিয়েছে। মানে, জীবন থেকে ঠিক নয়, স্মৃতি থেকে। ইংরেজিতে যাকে বলে, টেম্পোরারি মেমারি লস। বিষয়টা হয়তো সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপারই নয়, কারণ একদিন তিন ঘণ্টা আর কী এমন ব্যাপার? মানুষ তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমিয়ে বা অকাজে কাটিয়ে দেয়। তাছাড়া কার কখন কিছুক্ষণের জন্য টেম্পোরারি মেমারি লস হচ্ছে, কে আর হিসেব রাখে।কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। ওই তিন ঘণ্টায় এমন কিছু মারাত্মক ঘটে গিয়েছে যাতে আমার জীবনটা বড় একটা ধাক্কার মুখোমুখি হতে চলেছে।

ঘটনাটা আজ শনিবারের বারবেলার। শুরু করার আগে আমার শনিবার বিকেলের রুটিনটা একটু জানা প্রয়োজন। শনিবার আমার হাফ ডে অফিস। টিফিন নিয়ে যাই না। বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করে খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকাতে চোখ বোলাই। দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই। বেলা একটু পড়ে এলে হাঁটতে বেরোই। সেটাও একরকম রুটিন মাফিক। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা পার্ক আছে। সেখানে দু চক্কর দিয়ে একটা বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসি। আশেপাশে কয়েকটা বড় গাছ আছে। পাখিরা ওই সময় বাসায় ফেরে। কিচিরমিচির কলতান শুনতে খুব ভালো লাগে। তারপর সূর্যটা একটু নিস্তেজ হলে পাড়ায় কৈলাসের চায়ের দোকানে যাই। এক কাপ লেবু মশলা চা খাই।

তারপর একটা সিগারেট খেয়ে বাড়িতে গিন্নিকে ফোন করি। বাজার থেকে সান্ধ্যকালীন কিছু কেনাকাটা থাকলে সেটা সেরে বাড়ি ফিরে আসি। এই হল মোটামুটি শনিবারের বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে বিকেল সাড়ে ছ'টা পর্যন্তআমার রুটিন। এরপরে আমি নিজের লেখাপত্তর নিয়ে বসি।

এই সময়টা আমার গিন্নির রুটিনটাও একটু জানা প্রয়োজন। দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর সব গুছিয়ে তুলে গিন্নি শুতে আসে। কিছুক্ষণ মোবাইলে এটা ওটা সেটা দেখে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি যখন পার্কে বেরোনোর জন্য সাড়ে তিনটে নাগাদ উঠি, গিন্নি তখন ঘুমিয়ে থাকে। অধিকাংশ দিন ঘুম ভাঙে আমি যখন ছ'টা নাগাদ কৈলাসের চায়ের দোকান থেকে ফোন করি।

আজও এই রুটিনের ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। যদি হয়েও থাকে তাহলে আমার বাড়িতেই থাকার কথা। কিন্তু আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না আজ ওই তিন ঘণ্টা ঠিক কী হয়েছিল, আমি কোথায় ছিলাম, কী করেছি। আমার গিন্নিও কিছুতেই মনে করতে পারছে না। বুঝতেও পারছে না ব্যাপারটাকে আমি এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন! ওর যেটুকু মনে আছে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা পত্রিকা পড়ছিলাম। আমি ওকে কোনও ফোন করিনি। সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঘুম ভাঙার পর ও দেখেছে আমি বসার ঘরে বসে টিভিতে ফুটবল দেখছি।

বাড়িতে তৃতীয় কোনও প্রাণী নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। ফুটবল খেলা দেখার ব্যাপারটা আমার আংশিক মনে আছে। ডুরান্ড কাপে পুনের সঙ্গে গোয়ার খেলা। পুনে ২–১ গোলে জিতেছিল। জয়সূচক গোলটা হয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে। বাকি দুটো গোল হয়েছিল প্রথমার্ধে। সেই গোল দুটো লাইভ দেখার কথা একটুও মনে নেই। আমি প্রথমার্ধের গোলদুটো দেখেছি রিপ্লেতে। বাড়ি ফিরে আমি বেল বাজাই না। আমার কাছে সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি আছে। সুতরাং আমি বেরিয়েছিলাম না বাড়িতেই ছিলাম, গিন্নি নিশ্চিত নয়।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? তিনটে সম্ভাবনা। এক, আমি বাড়িতেই ছিলাম। দুই, আমি রুটিন মেনে বেরিয়ে যথা সময়ে ফিরে এসেছি। আর তিন, বেরিয়েছিলাম কিন্তু হাঁটা শেষ করে পার্কের বেঞ্চে আর বসিনি, কৈলাসের দোকানে আর চা–সিগারেট খেতে যাইনি। খেলা দেখব বলে সোজা বাড়ি চলে এসেছি। কিন্তু মোদ্দা কথা সেই একই। ওই তিন–ঘণ্টার কোনও হিসেব আমার কাছে নেই। স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে।

এইবার বিপদের কথা বলি। আজ বিকেলে পার্কের বেঞ্চে একটা মৃত্যু হয়েছে। খবরটা আমি পেয়েছি আমাদের পাড়ার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে। মৃত ব্যক্তি স্থানীয় নন। মানিব্যাগের মধ্যে থাকা পরিচয়পত্র থেকে জানা গিয়েছে ভদ্রলোকের নাম নিশীথ হালদার। বাড়ি বহরমপুরে। বাড়িতে পাড়া থেকে ফোন করেছিল। এই আচম্বিত মৃত্যু সংবাদে বাড়ির লোক একদম ভেঙে পড়েছে। তিনি কেন কলকাতায় আমাদের পাড়ার পার্কে এসেছিলেন, বাড়ির লোকের কোনও ধারণা নেই। তাঁর কাজের জায়গা কলেজ স্ট্রিট। কলকাতায় মেসবাড়িতে থাকতেন।

নিশীথবাবু বেঞ্চে স্থির হয়ে বসেছিলেন। ছেলেরা পার্কে ফুটবল খেলছিল। একবার বল ছিটকে এসে ওঁর গায়ে লাগে আর উনি লুটিয়ে পড়েন। আচমকা বলের আঘাতে ওঁর মৃত্যু হয়েছে না আগেই উনি মারা গিয়েছিলেন স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কয়েকজন ছবি পোস্ট করেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছেন। মুখের কোনও ছবি নেই। অথচ মুখটা দেখার আমার খুব দরকার। ডাক্তাররা প্রাথমিক ভাবে দেখে বলেছেন ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। বডি পোস্ট মর্টেম গিয়েছে।

পুলিশ পোস্ট মর্টেম করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু সূত্র পেয়ে যেতে পারে। ধরা যাক, নিশীথবাবুর শরীরে একটা জটিল বিষের হদিস পাওয়া যাবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করবে আর সেখান থেকেই শুরু হবে আমার বিপত্তি।

এখানেই আমার কপালে দুশ্চিন্তার বলিরেখাগুলো পড়েছে। দুটো সম্ভাবনা। এক স্বাভাবিক মৃত্যু আর দুই অস্বাভাবিক মৃত্যু। পুলিশ পোস্ট মর্টেম করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু সূত্র পেয়ে যেতে পারে। ধরা যাক, নিশীথবাবুর শরীরে একটা জটিল বিষের হদিস পাওয়া যাবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করবে আর সেখান থেকেই শুরু হবে আমার বিপত্তি।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জেনেছি, পাড়ার ছেলেরা যারা ফুটবল খেলছিল তারা পুলিশকে বলেছে, আলগোছে লক্ষ্য করেছে নিশীথবাবুকে। ওরা দেখেছে নিশীথবাবু বেঞ্চে বসে একজনের সঙ্গে গভীর কিছু আলোচনা করছিলেন। একটা পর্যায়ে দুজনকে বেশ উত্তেজিত দেখেছে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যে আমি নই বলাই বাহুল্য। কারণ পাড়ার ছেলেরা আমায় চেনে। আমি থাকলে সরাসরি আমার নামই বলে দিত। কিন্তু তাতে আমার বিপদ কমেনি।

আমি জানি বিষয়টা যখন অস্বাভাবিক মৃত্যু, পাড়ার ছেলেদের পুলিশ আরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। পার্কের বেঞ্চে কাকে–কাকে বসে থাকতে দেখেছে খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। ওরা খেলায় মত্ত থাকে, অত হয়তো ওদের মনে নেই। কিন্তু সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে, আমি গিয়ে থাকলে আর ওরা যদি আমাকে লক্ষ্য করে, তাহলে আমার নামটা উঠে আসবে।

স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহের তীর তখন আমার দিকে ঘুরবে। পুলিশ তখন কি অত সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে? আমার কাছে ওই সময়ে আমি কোথায় ছিলাম তার হিসেব চাইবে। তাতেই সবচেয়ে বেশি বিপত্তি। ওই যে তিনটে সম্ভাবনার কথা বললাম, তার বাইরে তো কিছু হতে পারে না। তাই তিনটে সম্ভাবনা নিয়ে তিনটে গল্প তৈরি করেছি। তার একটা তো সত্যি হবেই। কিন্তু কোনটা সত্যি সেটা যে নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। ধরা যাক, প্রথম সম্ভাবনা অর্থাৎ আমি বাড়িতেই ছিলাম সেটাই সত্যি। আমি তিন ঘণ্টার একটা নিখুঁত হিসেব তৈরি করেছি। ডুরান্ড কাপে পুনের সঙ্গে গোয়ার খেলাটা ইউ টিউবে দেখে দেখে পুরো মুখস্থ করে ফেলেছি।

নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। এক, সেই ছবি দেখে অজ্ঞাত পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যাবে। আর দুই, সেই ছবি দেখে পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত চমকে উঠবে। ছবিটা অবিকল আমার ছবি। এমনকি আমার বসার ভঙ্গিমাটা পর্যন্ত। ছেলেরা ধন্দে পড়বে। একদিকে নিশ্চিত করে আমার নাম বলতে পারবে না যে দেখেছে বলে, আরেক দিকে নিজেদের টুকরো টুকরো স্মৃতি থেকে ফুটে ওঠা থেকে আর্টিস্টের আঁকা ছবিটাকেও কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

সুন্দরী অফিসার তখন আমাকে আরও চেপে ধরবে। আমার কাছে ওই সময়ে আমি কোথায় ছিলাম তার হিসেব চাইবে। তাতেই সবচেয়ে বেশি বিপত্তি। সত্যি কথাটা, মানে স্মৃতিলোপের কথাটা কিছুতেই বলা যাবে না। আমার অ্যালঝাইমার্স নেই। এরকম স্মৃতিলোপের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। কখনও কোনও মনের ডাক্তারকে দেখাইনি। অতএব একটা কিছু বলতে হবে। ওই যে তিনটে সম্ভাবনার কথা প্রথমে বলেছি, তার বাইরে তো কিছু হতে পারে না।

তাই তিনটে সম্ভাবনার কোন গল্পটা সুন্দরী অফিসারকে বলব, সেটা যে নিজেই বুঝে উঠতে

স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহের তীর তখন আমার দিকে ঘুরবে। পুলিশ তখন কি অত সহজে আমাকে ছেড়ে দেবে? আমার কাছে ওই সময়ে আমি কোথায় ছিলাম তার হিসেব চাইবে। তাতেই সবচেয়ে বেশি বিপত্তি। ওই যে তিনটে সম্ভাবনার কথা বললাম, তার বাইরে কিছু হতে পারে না।

আমাদের থানায় সম্প্রতি এক মহিলা অফিসার এসেছেন। রীতিমতো সুন্দরী। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কেউ একজন ছবি দিয়েছিল। ইউনিফর্মে শুধু চটকদার সুন্দরী নয়, রীতিমতো স্মার্ট দেখতে লাগে। কৈলাসের চায়ের দোকানে ওঁকে নিয়ে আলোচনা শুনেছি। সুন্দরী অফিসার কিন্তু দারুণ দক্ষ আর রীতিমতো কড়া। ছোটখাট পেটি কেসেও নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকে। এখানেই আবার দুটো সম্ভাবনা। এক, এই মৃত্যু তদন্তের ভার এই সুন্দরী অফিসারের হাতে পড়বে নয়তো অন্য কারো হাতে।

আমি প্রথম সম্ভাবনাটাই ধরে নিলাম। আমার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটাই ধরে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ ওই সময়ের স্মৃতি আমার নেই। যদি আমি গিয়ে থাকি আর পাড়ার ছেলেরা আমাকে খেয়াল না করে থাকে তাহলে একরকম গল্প। আর যদি আমি না গিয়ে থাকি, অজ্ঞাত কোনও আততায়ী গিয়ে থাকে, তাহলে আবার নতুন একটা সম্ভাবনা। সম্ভাবনাটা হচ্ছে, ওই সুন্দরী অফিসার প্রথমেই যেটা করবে তদন্তে নেমে ওদের আর্টিস্ট আনবে। পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞেস করে করে আর্টিস্ট ওই অজ্ঞাত ব্যক্তির ছবি আঁকাবে। আর এখানেই আবার দুটো

পারছি না। ধরা যাক, প্রথম সম্ভাবনা অর্থাৎ আমি বাড়িতেই ছিলাম সেটাই সত্যি। আমি তিন ঘণ্টার একটা নিখুঁত হিসেব তৈরি করেছি। ডুরান্ড কাপে পুনের সঙ্গে গোয়ার খেলাটা ইউ টিউবে দেখে দেখে পুরো মুখস্থ করে ফেলেছি। কিন্তু কথায় আছে পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা! পুলিশ কি অত সহজে ছেড়ে দেবে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে আর ঠিক ধরে ফেলবে। যেমন—

সুন্দরী অফিসার সব শুনে আমার তারিফ করে গালে মৃদু টোল ফেলে হেসে জিজ্ঞেস করবে, বাহ্, আপনার স্মৃতিশক্তি তো প্রখর। একটা খেলা টিভিতে দেখে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রেখেছেন! গোয়া যে প্রথম ফাউলটা করেছিল সেটা পর্যন্ত মনে রেখেছেন! আচ্ছা বলুন তো, ইস্টবেঙ্গল–মোহনবাগানের শেষ যে ডার্বিটা হয়েছিল, সেখানে কোন দল প্রথম ফাউলটা করেছিল?

কিছুতেই মনে করতে পারব না। ভয়ে চোখদুটো বন্ধ করতেই সুন্দরীর কঠিন চোয়ালটা দেখতে পাব। না, এই সম্ভাবনাময় গল্পটা বলা যাবে না। তার চেয়ে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা বলি। অর্থাৎ, বেরিয়েছিলাম কিন্তু হাঁটা শেষ করে

পার্কের বেঞ্চে আর বসিনি, কৈলাসের দোকানে আর চা–সিগারেট খেতে যাইনি। খেলা দেখব বলে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলাম।

সুন্দরী অফিসার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মাথার টুপিটা খুলে বিজ্ঞাপনে দেখানোর মতো কালো চকচকে রেশমি চুলগুলো দুলিয়ে বলবে, নিশ্চিন্ত হলাম। তবে ছেলেগুলোর বর্ণনা শুনে আর্টিস্ট যে ছবিটা এঁকেছে তার সঙ্গে আপনার মুখের এত মিল যে ব্যাপারটা ধন্ধে ফেলছে।

ভয়ে চোখদুটো বন্ধ করে সুন্দরীর শক্ত চোয়ালটা দেখতে পেলাম। তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা?

আমাকেও। দেখুন ছেলেরা কিন্তু আমার নাম বলেনি। ওরা প্রত্যেকে আমাকে চেনে।

ঠিক। আসলে কি বলুন তো, খেলার সময় অত কি আর মন দিয়ে দেখেছিল আপনাকে? নিজেরাই তো বলছে, একটা তর্কাতর্কি হতে দেখেছিল কিন্তু খেলায় এত মশগুল ছিল যে ওসব নিয়ে মাথাই ঘামায়নি।

আচ্ছা, আপনার কোনও যমজ ভাই আছে? ঠিক আপনার মতো দেখতে?

তা নেই ম্যাডাম। তবে কোথায় যেন পড়েছিলাম, পৃথিবীতে একরকম দেখতে পাঁচজন পর্যন্ত ব্যক্তি থাকতে পারে।

বাহ, এটা তো দারুণ সূত্র দিলেন। নাহ, আপনাকে রুল আউট করে সেই ব্যক্তিকে খুঁজতে হবে। তবে আপনাকে রুল আউট করার জন্য সামান্য একটা কাজ করতে হবে। আমরা পার্কের বেঞ্চ থেকে কিছু ডিএনএ স্যাম্পেল জোগাড় করেছি। পৃথিবীতে একরকম দেখতে একাধিক মানুষ থাকলেও তাদের ডিএনএ কিন্তু আলাদা। আমরা আপনার ডিএনএ–এর নমুনা নেব। আপনি প্রস্তুত?

ভয়ে চোখদুটো বন্ধ করে সুন্দরীর শক্ত চোয়ালটা দেখতে পেলাম। তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা সামলাতে পারব কিনা ভাবা যাক। দ্বিতীয় সম্ভাবনা অনুযায়ী হাঁটা শেষ করে পার্কের বেঞ্চে আর বসিনি। কিন্তু আসলে তো আমার মনে নেই। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য বসেছিলাম। তখন হয়তো সেই লোকটাই আসেনি। কিন্তু আমার বসার প্রমাণ স্বরূপ ডিএনএ'টা রয়েই গিয়েছে।

সুতরাং সুন্দরী অফিসারকে তৃতীয় সম্ভাবনাটা বলতে হবে। অর্থাৎ আমি রুটিন মেনে হেঁটে, পার্কের

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।।

বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসে, কৈলাসের দোকান থেকে চা খেয়ে বাড়ি ফিরে, ডুরান্ড কাপে পুনের সঙ্গে গোয়ার খেলাটা হাফ টাইমের পর থেকে দেখেছি।

সুন্দরী অফিসার একটু চিন্তিত মুখে বলবে, তাহলে তো আপনার ডিএনএ–এর সঙ্গে পার্কের বেঞ্চে পাওয়া ডিএনএ মিলে গেলেও আপনার বিরুদ্ধে চার্জশিট ফ্রেম করা যাবে না। আপনার উকিল বলবে, পার্কে আপনি নিয়ম মতো গিয়েছিলেন এবং আপনি উঠে বাড়ি চলে আসার পর নিশীথ হালদার পার্কে গিয়েছিলেন। ছেলেরা রোজ আপনাকে পার্কে দেখে। কেউ আপনার ভঙ্গিতে পার্কের বেঞ্চে বসে থাকলে অবচেতনে আপনার মুখটাই রয়ে যাবে। আর্টিস্টকে সেই বর্ণনাই দেবে। এরকম হয়েই থাকে।

বেশ নিশ্চিন্ত লাগল। সুন্দরী অফিসার বাড়িতে তদন্তে এলে বলব, আমি চাই এই খুনের কিনারা হোক। আপনাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করব। নিন আমার ডিএনএ–এর নমুনা। আমার কোনও আপত্তি নেই। চা খাবেন?

সুন্দরী অফিসার চোখ মটকে বলবে, কোথায়? কৈলাসের দোকানে নিয়ে যাবেন?

আমি সলজ্জ গলায় বলব, আহা, আপনি কীভাবে?

কিছুতেই সেই ক্লু–টা তো পাচ্ছি না। যাকগে, ছাড়ুন। আমি ভাবছিলাম আপনি চায়ের ব্যাপারে এত শৌখিন, তাহলে কৈলাসের দোকানে সস্তার লেবু চা খেতে যান কেন?

এটার উত্তর সত্যিই আমার কাছে নেই। এই সময়ে সম্ভাবনা হচ্ছে সুন্দরী অফিসার চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলবে, বিষের সঙ্গে ভাবাচ্ছে, নিশীথবাবু কলেজ স্ট্রিট থেকে এই শোভাবাজারে কেন এসেছিলেন? আচ্ছা, আপনার কলেজ স্ট্রিটে যাতায়াত আছে না? নিশীথবাবুর পকেটে কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশকের লেটারহেডে চিরকুটে আপনার নাম লেখা ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে।

আমার কপালে বিজবিজে ঘাম ফুটে উঠল। বিষ নিয়ে আমি একটা গবেষণামূলক বই লিখছি। এই বইয়ের প্রকাশক পাওয়া কঠিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত একজন প্রকাশককে পেয়েছিলাম। পাণ্ডুলিপি তাঁর পছন্দ হয়েছে। কম্পোজও করিয়েছেন। আজ একজনকে আমার কাছে পাঠানোর কথা ছিল প্রুফটা দিয়ে। বিকেলবেলাই তাঁর আসার কথা ছিল।

সুন্দরী অফিসার বলবেন, চলুন আপনার পড়ার

সুন্দরী অফিসারের চেরি ফলের মতো ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হবে। কিন্তু চায়ের কাপটা সেখানে ছোঁয়ানোর আগে স্বগতোক্তি করবে, বিষ। আমি অস্ফুস্ট গলায় বলে ফেলব, না ম্যাডাম চায়ে কোনও বিষ নেই। ––কিছু বললেন?––নিজেকে সামলে নিয়ে বলব, বিষ।

প্রথমদিন বাড়িতে এসেছেন। বসুন।

চা'টা আমি নিজের হাতেই করব। রোজ সকালে আমি চা করি। গিন্নি আমার হাতের চায়ের তারিফ করে। চায়ের কাপটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে বলব, নিন। চা'টা আগে খেয়ে নিন। তারপর আমার ডিএনএ–এর নমুনা নিন।

চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে সুন্দরী অফিসার লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলবে, বাহ, দারুণ সুবাস তো!

দার্জিলিং ফার্স্ট ফ্লাস। চায়ের ব্যাপারে আমি খুব খুঁতখুঁতে ম্যাডাম। আমার এই একটামাত্র শখ বলতে পারেন। দামি চা'পাতা কেনা।

সুন্দরী অফিসারের চেরি ফলের মতো ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হবে। কিন্তু চায়ের কাপটা সেখানে ছোঁয়ানোর আগে স্বগতোক্তি করবে, বিষ।

আমি অস্ফুস্ট গলায় বলে ফেলব, না ম্যাডাম চায়ে কোনও বিষ নেই।

কিছু বললেন?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলব, বিষ। ঠিক ম্যাডাম। আমিও ভাবছিলাম বিষ প্রয়োগটা হল ঘরটা একটু দেখে আসি...

লাফিয়ে উঠে আমার পড়ার ঘরে এলাম। সম্ভাবনা দুটো। এক, লোকটা এসে আমাকে প্রুফ দিয়ে গিয়েছে অথবা দুই, লোকটা আদৌ আসেনি। আমি তন্নতন্ন করে টেবিলের ওপর বইপত্তর কাগজ ঘাঁটতে থাকলাম।

গিন্নি ঘরে ঢুকে বলল, উফ কী করছ বলো তো! এক তো কোনও জিনিস গুছিয়ে রাখো না। তার ওপর সব লণ্ডভণ্ড করছ। সেই আমাকেই গুছিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা, তখন জিজ্ঞেস করছিলে না বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে কিছুতেই মনে করতে পারছ না! বিকেলে তো গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে। তুহিন আর পিউ তোমাকে দেখেছে। কী সব কাণ্ড নাকি তুমি করছিলে। গঙ্গার ঘাটে ফেলা যাওয়া আকন্দ ফুল বাছছিলে। শুঁকে শুঁকে দেখছিলে। তুহিন তোমাকে ডেকেছিল, উত্তরই দাওনি। এ কীরকম অসভ্যতামো শুরু করেছ? তোমার ওই বিষ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করো এবার। তোমার মাথাটাই যাচ্ছে!

তুলিকলা: শ্রীতমা

সর্বেষাং নাথভূতাসি ত্বমেবেকাকিনী যতঃ।
তস্মান্নমামি দেবেশি প্রসন্না বরদা ভব॥
তুমি একাই সকলের রক্ষা করো, তাই তুমি প্রণম্য।
তোমাকে প্রণাম জানাই। হে দেবশ্রেষ্ঠা তুমি দয়া করে
প্রসন্ন হয়ে বর দাও।

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

আর মাত্র সাতদিন

প্রচেত গুপ্ত

সম সময়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। জন্ম ১৪ অক্টোবর, ১৯৬২। অর্থনীতিতে স্নাতক। প্রথম উপন্যাস 'আমার যা আছে'। বইয়ের সংখ্যা পৌনে একশোর উনিশ-বিশ। গল্প-উপন্যাস নিয়ে টেলিফিল্ম, সিনেমা হয়েছে। লেখকের কথায়, 'চকিতে সবকিছু থেকে, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ভিতরে হাহাকার জাগে। ভূতগ্রস্তের মতো লিখতে বসি। বুঝি, এইটাই আমি।' বাল-সাহিত্য অকাদেমি সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত। কিছু গল্প হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠি ভাষায় অনূদিত।

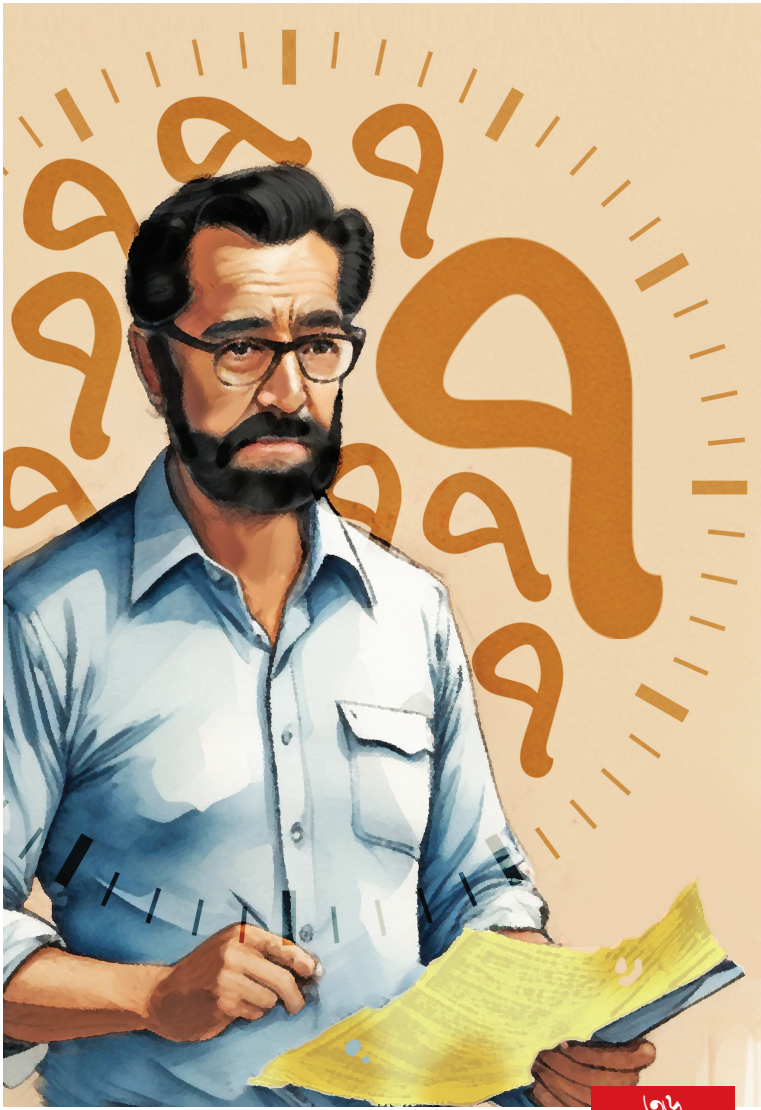

আর মাত্র সাতদিন।

কানাই সামন্তের হাতে-ধরা কাগজ তেমনই বলছে। আজ বুধবার। এখন সকাল, পুরো দিনটা ধরলে, সাতদিন পরে, মানে ঘটনা ঘটবার কথা আগামী বুধবার।

কানাই সামন্ত বুঝতে পারলেন, তাঁর কান ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে এই সমস্যা। ঘাবড়ে গেলে তাঁর কান ঠান্ডা লাগে। বন্ধুরা মজা করে বলত, অতি স্বার্থপরের কান ঠান্ডা হয়। ডাক্তারও দেখানো হল। ক্লাস সিক্স তখন। ডাক্তারবাবু মুচকি হেসেছিলেন।

স্বভাবের সঙ্গে ঠান্ডা-গরমের সম্পর্ক নেই। তাছাড়া কান যদি গরম হতে পারে, ঠান্ডা হতে পারবে না কেন? বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।

কানাইবাবুর বয়স বেড়েছে কিন্তু ঠিক হয়নি। আজ হাতের কাগজটা পড়বার পর শরীরও হালকা লাগছে, মনে হচ্ছে গলা শুকিয়ে আসছে। কানাইবাবু এতক্ষণ উবু হয়ে ছিলেন, এবার মেঝের ওপর একরকম 'ধপ্' করে বসে পড়লেন। এটা বাড়ির দক্ষিণের ঘর। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু ভাঙা, অকেজো আসবাব রাখা। কানাইবাবুর স্ত্রী কল্যাণীর এই নিয়ে আপত্তি আছে।

এগুলো নিয়ে হবে কী? বিদায় করো এই দামড়া আলমারি, হাতলভাঙা চেয়ার, পায়াভাঙা টেবিল। উইপোকার আড়ত হয়েছে।

কানাইবাবু বলেন, আহা কল্যাণী, এসব পিতামহ, প্রপিতামহ, তস্য প্রপিতামহের আমলের ফার্নিচার। হুট বলতে বিদায় করা যায় নাকি? একটা সেন্টিমেন্ট আছে না?

সেন্টিমেন্ট কিছু না, আসলে মনের মতো দাম পাচ্ছেন না কানাইবাবু। অকশনের লোক ধরে এনেছিলেন।

দাম হবে না দাদা। এখন হল ফ্ল্যাটের যুগ। এসব ঢাউস মাল ঘরে কে ঢোকাবে?

'দাম হবে না' শুনে পত্রপাঠ সেই লোক বিদায় করেছেন কানাইবাবু। থাক পড়ে। যেদিন দাম হবে, সেদিন দেখা যাবে।

এখন কানাইবাবু বসে পড়েছেন অমনই এক ঢাউস আলমারির সামনে। এই জিনিসের বয়স একশো হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কালো বার্নিশ চটে খসটে হয়ে গিয়েছে। পাল্লা ভাঙা, কাচে চিড়। তাকভর্তি হাবিজাবি, বাতিল কাগজ, ফাইল, দড়িবাঁধা দলিল-দস্তাবেজ। আলমারির একবারে নীচে লম্বা ড্রয়ার। গভীর, অনেকটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো। প্রায় মেঝেতে বসে পড়ে খুলতে হয়। মনের মতো দাম না পাওয়ার অন্যতম কারণ এই ডিজাইন। কে বারবার নিচু হবে? হাঁটু কোমরের সমস্যা এখন সকলের। আজ এক বিশেষ কারণে উবু হয়ে বসে ড্রয়ার খুলেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই আলমারিতে যে এমন একটা ড্রয়ার রয়েছে সে কথাই বেরোবেন। ফাঁকা ঘরে কানাইবাবু বিড়বিড় করে উঠলেন।

কী এসব! কে লিখেছে?

দুনিয়ায় এক ধরনের মানুষ থাকে, যারা হয় মাঝামাঝি প্রকৃতির। সব ব্যাপারেই মাঝখানের পজিশন নেয়। এরা মূলত স্বার্থপর। বাসে উঠে ঠেলেঠুলে মাঝখানে যেতে চায়। অ্যাক্সিডেন্ট কিছু ঘটলে আগে-পিছে যাত্রীদের যা হওয়ার হোক, নিজে বাঁচলেই হল। জীবনযাপনেও তাই। এরা প্যাতেপেতে ভীতু মানুষ যেমন নয়, আবার শক্ত মনেরও হয় না। হুট বলতে ঘাবড়ে যায় না, আবার ঝট্ বলতে সাহসও দেখাতে পারে না। ভালো-মন্দ, সত্যি-মিথ্যে, সৎ-অসৎ নিয়ে সর্বদা দোটানায় থাকে। নিজের জন্য যেটা ভালো, সেটাই 'উচিত' বলে মনে করে। তবে এই সব মাঝামাঝি-মানুষের একটা গুরুতর উল্টো অসুখও থাকে। সেই অসুখ মাথাচাড়া দেয় কদাচিৎ, তবে দেয়। কানাই সামন্ত হলেন সেই 'মাঝামাঝি-মানুষ'। নিজের স্বার্থ ছাড়া খুব একটা কিছুতে মাথা ঘামান না। একটা পা ফেলবার আগে দোটানায় থাকেন, লাভ কিছু হবে? আচ্ছা, কানাইবাবু কি উল্টো অসুখের পাল্লাতেও পড়বেন? পড়লে দেখা যাবে।

কাগজটা চোখের কাছে তুলে আনার পর পড়লেন কানাইবাবু। আর তারপরই তাঁর কান ঠান্ডা, কপালে ঘামের বিন্দু। ছেচল্লিশ বছর বয়সে মাত্র চার শব্দের কোনও বাক্য পড়ে কপালে ঘাম জমানো সহজ কথা নয়।

খেয়াল ছিল না। চোখে পড়তে মনে হল, 'দেখি একবার'। আর সেই দেখতে গিয়েই সুড়ঙ্গ-ড্রয়ার থেকে কাগজটি পেয়ে গেলেন কানাই সামন্ত। হলদে হয়ে আসা পুরোনো পাতা। কালো কালিতে নানা ধরনের আঁকিবুকি, নকশা, খুদে হরফের লেখায় ভর্তি। যেন কেউ পাতা ভরে হিসেব কষেছে। দুটো তারিখও রয়েছে। একটা রয়েছে পাতার মাথায়, যেমন চিঠিপত্রে থাকে। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কবে লেখা হয়েছে। অন্য তারিখটি পাতার নীচের দিকে, মার্জিনের পাশে। সেই তারিখের চারপাশে আবার লাল কালিতে গোল দাগ। গোলের মধ্যে চার শব্দের একটি বাক্য। অক্ষর খুব ছোট আর কাঁপা হাতের লেখা বলে প্রথমে পড়তে পারেননি কানাইবাবু, কাগজ চোখের কাছে তুলে আনার পর পড়লেন। আর তারপরই তাঁর কান ঠান্ডা, কপালে ঘামের বিন্দু।

ছেচল্লিশ বছর বয়সে মাত্র চার শব্দের কোনও বাক্য পড়ে কপালে ঘাম জমানো সহজ কথা নয়। কানাইবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, ঘরে কেউ ঢুকেছে কিনা। কল্যাণী কোথায়? পরক্ষণেই মনে পড়ল, স্ত্রী রান্নাঘরে। এই সময়ে তার রান্নাঘরে থাকবারই কথা। একটু পরেই স্নানখাওয়া সেরে কানাইবাবু অফিসে

কানাইবাবু বুঝলেন, মন শক্ত করতে হবে। হঠাৎ হাতে-আসা কাগজের ধাক্কা সামলাতে হবে। নার্ভাস হলে সব ওলটপালট হয়ে যাবে। পাতাটির দিকে ফের তাকালেন। মাপে সাধারণ খাতার থেকে একটু বড়ই হবে। এতটাই পুরোনো হয়েছে যে সাদা রং এখন হলদেটে। ওপর-নীচের কিছু জায়গায় পোকায় কেটে ফুটোও করেছে। খামে ভরে ড্রয়ারের একেবারে পিছনে রাখা ছিল। গত ছেচল্লিশ বছর কেউ হাত দিয়েছে কিনা সন্দেহ। ছেচল্লিশ বছর, কারণ পাতার ওপরের তারিখটি সে কথাই বলছে। কানাইবাবু উবু হয়ে বসে ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে হাতড়েছিলেন। হাতে কাগজের মতো কিছু ঠেকে যাওয়ায় টেনে বের করে দেখেন, সবজেটে রঙের লম্বা খাম। খাম থেকে পাতাটি বের করে আর পাঁচটা ফালতু কাগজের মতো হাবিজাবি ভেবে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন বিরক্ত কানাইবাবু। বিরক্ত তো হবেনই। সেই সকাল থেকে রাজ্যের কাগজ, খাম, ফাইল ঘাঁটা শুরু করেছেন। কত যে ফেলছেন! এই পাতায় এসে থমকে গেলেন। না থেমে উপায় কী? লেখায় চোখ পড়ে গেল যে। একবারে শুরুতে কাঁপা হাতে আর খুদে হরফে লেখা—

‘পুত্র সন্তান,
(নাম এখনও স্থির হয় নাই)
পিতা— অম্বরীশ সামন্ত।
মাতা— কনকময়ী সামন্ত।
জন্ম— কলকাতাস্থিত হাসপাতাল।’

সন্তানের জন্মতারিখ, জন্মক্ষণ সবই লেখা রয়েছে। কানাইবাবু চমকে উঠেছেন। এ যে তার কথা! পিতা, মাতা, জন্মতারিখ, জন্মস্থল সবই মিলে যাচ্ছে। এরপরেই পাতাটি দু’হাতে ধরে আগাপাস্তলা পড়ে ফেলেন। যত পড়েন চোখ তত বড় হয়ে যেতে থাকে।

সাতসকালে বাতিল, পুরোনো কাগজে ঠাসা, ধুলোভরা এই প্রাচীন আলামারি খুলে হাটকানোর কারণ কী? কারণ একটি সার্টিফিকেট। এক সময়ে পোস্টাপিসে অতি সামান্য কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিলেন কানাইবাবু। ভুলেই গিয়েছিলেন সেকথা। হঠাৎ এক রাতে ঘুমানোর আগে মনে পড়ে গেল। রাতে বালিশে মাথা রেখে জমা-খরচের হিসেবে রিভাইস দেওয়ার অভ্যেস কানাইবাবুর অনেকদিনের। কোথায় কত টাকা জমানো আছে, আসল কত, সুদই বা কোথায় পৌঁছল, মনে মনে ঝালিয়ে নেন। সেদিন মাথার ওপরের তারিখ জানাচ্ছে, এই কাগজ তৈরি হয়েছে তাঁর জন্মের তিনদিন পরে। অর্থাৎ কানাই সামন্ত এবং কাগজের বয়স একই, ছেচল্লিশ বছর। তিনদিনের ছোট। আর গোল দাগের ভিতরের তারিখ এবং বাক্যটি বলছে, আর মাত্র সাতদিন। কাগজ জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খুদে হরফে কিছু লেখা, কিছু জ্যামিতির মতো নকশা। অনেকটা ভাগ্যগণনা, কোষ্ঠিবিচারের মতো। তবে শুধু জ্যোতিষ নয়, বিজ্ঞানও রয়েছে। এক কোনায় আলোর গতিবেগ, পদার্থের পতন, নক্ষত্রের বিলুপ্তির কথা উল্লেখ করে ছোটখাট ফর্মুলা সাজানো। একটা সিঁড়িভাঙার অঙ্কও রয়েছে মনে হচ্ছে। শেষ না হওয়া আধখানা অঙ্ক। আরে! বাঁ দিকের কোনায় গানের লাইন না? হ্যাঁ, লাইনই তো লেখা। কানাইবাবু অবাক হয়ে পড়লেন। চেনা গান, কল্যাণী গুনগুন করে।

‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু...’।

হতবাক হয়ে গেলেন কানাই সামন্ত। এ যে এক জগাখিচুড়ি কাগজ। এটিকে তো ভাগ্যবিচার বলা যাচ্ছে না, ভাগ্যবিচার হলে বিজ্ঞান আসবে কেন? আর বিজ্ঞান যদি বা আসে, গান কোথা থেকে এল?

ঘটনা ঘটবার কথা সামনের বুধবার। তারিখ ধরে এগোলে মঙ্গলবারের রাত বারোটা টপকালেই বুধবার। কানাইবাবু ঢোক গিললেন। ঘটনা বুধবার কখন ঘটতে পারে? অন্ধকার থাকতে? নাকি সকালের আলোতে?

এরকমই এক সময় ফ্ল্যাশব্যাকে উঠে এসে হারিয়ে-যাওয়া সঞ্চয় সার্টিফিকেটটি চোখের সামনে নেচে উঠল। আরে! কাগজটা গেল কোথায়? মেয়াদের সময় ফুরিয়েছে। এবার সার্টিফিকেটটা জমা করলে কটা টাকা জুটে যাবে। কানাইবাবু হাত বাড়িয়ে কাঁধে নাড়া দিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন।

কল্যাণী, সার্টিফিকেট কোথায়?

ঘুমের দোরগোড়ায় সবে পা রেখেছিলেন কল্যাণী, স্বামীর ধাক্কায় সেই পা টেনে নিলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, কীসের সার্টিফিকেট?

পোস্টাপিসের সেভিংস।

কল্যাণী বিরক্তি আরও বাড়িয়ে বললেন, আমায় বলছ কেন? আমি কি পোস্টমাস্টার? এমনি টাকাই হাতে দাও না তো সঞ্চয়ের সার্টিফিকেট দেবে... বিরক্ত কোরো না, ঘুমোতে দাও।

স্ত্রীর বিরক্তিতে কানাইবাবু পাত্তা দিলেন না। সার্টিফিকেট পেতেই হবে। পরদিন থেকেই খোঁজা শুরু। এ-ঘর ও-ঘর, এ-আলমারি, সে-আলমারি করতে করতে, আজ সকালে এই দক্ষিণের ঘরে এসে পৌঁছেছেন এবং এই ভয়ঙ্কর কাগজটি হাতে এসেছে। ‘এসেছে’ নাকি ‘ঠেকেছে’?

একবার, দু’বার... সাতবার পর্যন্ত পড়লেন।

এরপরেই কানাইবাবু নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন। গোলের ভিতর তারিখ নিয়ে তিনি কি ভুল হিসেব করছেন? এত সহজ হিসেব ভুল হবে কেন? হতে পারে। অতি সোজা কাজেও গোলমাল হয়। জল খেতে গিয়েও মানুষ বিষম খায়। অথচ জলের মতো সহজ আর কী আছে? কানাইবাবু সন্দেহমুক্ত হতে আবার হিসেব করলেন। প্রথমে আঙুলের কর গুণে বিয়োগ, তারপর মুখে বিড়বিড় করে যোগ। হিসেবের এই টেকনিকের নাম ‘দেখা-শোনা টেকনিক’। স্কুলে বিভাসমাস্টার শিখিয়েছিলেন।

অঙ্ক ঠিক করবার টেকনিক রয়েছে। টেকনিকের নাম দেখা-শোনা টেকনিক। হিসেব করবার সময় প্রথমে আঙুলের কর গুনবি। গোনবার সময় আঙুল তুলবি চোখের সামনে, যাতে দেখতে পাস। তারপর জোরে জোরে বলবি। এমন জোরে, যেন কানে শুনতে পাস। এই দেখা আর শোনা মিললে তবে অঙ্ক কারেক্ট।

ছেচল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেও কানাইবাবু সেই ‘টেকনিক’ ব্যবহার করলেন। দেখা, শোনা একই কথা বলছে, আর সাতদিন। তার মানে ঘটনা ঘটবার কথা সামনের বুধবার। তারিখ

ধরে এগোলে মঙ্গলবারের রাত বারোটা টপকালেই বুধবার। কানাইবাবু ঢোক গিললেন। ঘটনা বুধবার কখন ঘটতে পারে? অন্ধকার থাকতে? নাকি সকালের আলোতে? আধখানা দিন পাওয়া যাবে কি? নাকি যা হওয়ার হবে বেলা ফুরোলে সন্ধের পর? কাগজে সময়ের কথা কিছু লেখা নেই। বিভাস মাস্টার এখন থাকলে ভালো হত। মানুষটা পাটীগণিতে ছিলেন জবরদস্ত। যা খুশি থেকে যা খুশি বের করে দিতে পারতেন। দীঘির গভীরতা থেকে বাতাসের গতি, পথের দূরত্ব থেকে রেলগাড়ির বগির সংখ্যা, জোনাকির জ্বলা-নেভা থেকে ফুটবলের ব্যাসার্ধ। ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে ঘষঘষিয়ে কষে দিতেন। এক্ষেত্রেও নিশ্চয় পারতেন। তারিখ থেকে ঘণ্টা মিনিট হিসেব কষে ঠিক বের করে দিতেন।

কানাইবাবু কাগজে চোখ দিলেন ফের। ফের দেখলেন লাল গোল দাগের মধ্যে তারিখ দিয়ে নীচে স্পষ্ট লেখা—

'এই তারিখই পুত্রের মৃত্যুদিন।'

আবার সব গুলিয়ে গেল কানাইবাবুর। আবার হিসেব করতে লেগে গেলেন। 'মৃত্যুদিন' সাতদিন পরেই তো? এই নিয়ে কতবার হিসেব কষছেন তিনি? আটবার? ন'বার? নাকি দশ ছাড়িয়ে গেল? আবারও গুনবেন নাকি? সারাদিন ধরে শুধু গুনেই যাবেন? যদি সত্যি সাতদিন বাকি পড়ে থাকে, সেই সাতদিনও কি এইভাবে হিসেবে কেটে যাবে? এবার নিজের ওপর রাগ হল কানাইবাবুর। মাঝামাঝি-মানুষের এই হল সেই অসুখ, উল্টো অসুখ। যা খুব কদাচিৎ মাথাচাড়া দেয়, কিন্তু দেয়। তখন নিজের ওপর যেমন রাগ, বিরক্তি হয়, মাথার ভিতর ঝাঁকুনি হয়। সেই ঝাঁকুনি মাঝামাঝি-মানুষকে ধমক দেয়। কানাই সামন্তকে এখন যেমন দিল।

ধুস্, কেন এত যোগ-বিয়োগ কষছেন কানাইবাবু? জীবন থেকে মরণে যাওয়ার হিসেব নিয়ে করবেনটা কী? ঘটনা আজ হলেও যা, কাল হলেও তাই। রাতে হলে যা, সকালে হলেও তাই। ফিনিশ তো ফিনিশই। বিড়িবিড় করা আর আঙুলের কর গোনা থামান দেখি মশাই!

কানাইবাবু কিছু বলতে চাইলেন। মাথার ভিতরের ঝাঁকুনি বলতে দিল না। সে বলতে থাকে ফের।

সাতদিন হোক আর সাত লক্ষ দিন হোক, কেটে পড়তে তো হবেই মশাই। আর এই আঁকিবুকি আঁকা, লেখার মূল্য কী? এরকম কত বুজরুকি হয়। ছক কষে কি আগে থেকে কিছু বলা যায়? দেখছেন না, জীবন-মরণের হিসেব গোলাতে কেমন হরস্কোপের সঙ্গে সায়েন্স মিলিয়েছে। আবার গানও রেখেছে! ভাঁওতা ছাড়া কী? আপনাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

বিন্ধ্যস্থাং বিশ্বনিলায়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্।
যোগিনীং যোগমায়াঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥

যিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করেন, যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ আধার, যিনি পরমলোকে অর্থাৎ স্বর্গে বাস করেন, যিনি যোগী রূপ ধারণ করে থাকেন, সেই যোগমায়া চণ্ডিকাকে প্রণাম করি।

আর যদি এই কাগজের কথা বিশ্বাস করে ফেলেন, সাতটা দিনের জীবন মনের মতো করে কাটিয়ে নিন। যা এতদিন পারেননি, সেরে ফেলুন। কত গল্প, সিনেমা, থিয়েটার আছে এরকম। মৃত্যুর আগে হাতে সময় পেয়ে ইচ্ছে মিটিয়ে নিচ্ছে। আছে না? গল্পটল্প পড়া অবশ্য আপনার ধাতে নেই। যাক্, গোনাগুনতির ভ্যাজভ্যাজানি বন্ধ করে, টেঁসে যাওয়ার আগে ভয় ঝেড়ে ফেলে কিছু করে ফেলুন দেখি।

মাথার ঝাঁকুনি থামবার পর আরও খানিকটা সময় থম্ মেরে বসে রইলেন কানাইবাবু। তারপর ড্রয়ার ফুঁড়ে পাওয়া 'মৃত্যু পরোয়ানা'টি ভাঁজ করে, ফতুয়ার পকেটে রেখে উঠে পড়লেন। উঠতে উঠতেই অনুভব করলেন, কানের ঠান্ডা ভাব আর নেই। গলাও শুকনো লাগছে না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, শালার মরণ।

আজ অফিসে নির্ঘাত লেট। কানাইবাবু তাড়াহুড়ো করে ভাত খাচ্ছেন।

কল্যাণী বললেন, আস্তে খাও, বিষম লাগবে।

কানাইবাবু বললেন, লাগলে লাগবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কল্যাণী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, সারা সকাল

অনেকটা দেরি করে ফেলল। ছুটি জমা না থাকায়, বেচারির বেতন কাটা গেল। অনেক কান্নাকাটি করাতে ম্যানেজার পরেশকে বললেন, ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ কানাই সামন্ত যদি লিখে দেন, তবেই ভেবে দেখা হবে।

ইচ্ছে করেই বলা। অফিসে সবাই জানে কানাই সামন্ত অন্যের জন্য কিছু করতে গেল দশবার ভাবেন এবং তারপর থমকে যান। মুখে বলেন, দেখো বাপু, গোলমেলে কাজে আমাকে জড়িও না।

পরেশের বেলাতেও এতদিন তাই চলছিল। আজ অফিসে এসেই পরেশকে ডেকে বললেন, তোমার দরখাস্তটা নিয়ে এসো, সই করে দিই। আর এক কাপ চা–ও নিয়ে এসো।

পরের দুটো দিন আর কিছু হল না। তিন নম্বর দিনে আরেক কাণ্ড। অফিস থেকে ফেরবার পথে কানাইবাবু কসবায় জগন্নাথের বাড়ি গেলেন। জগন্নাথ মাইতি। কলেজের বন্ধু। কলেজে পড়বার সময় হস্টেলের টাকা দিতে গিয়ে একবার বেজায় ঠেকায় পড়েছিলেন কানাইবাবু। কথা তো আজকের নয়, সেই সাতাশ–আঠাশ বছর আগের। জগন্নাথ বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তিনশো ছাপ্পান্ন টাকা হাতে তুলে দিয়েছিল।

রত্না রাজি হয়েছেন। ফলে আর শুয়ে থাকলে চলবে না, বিছানা ছাড়লেন কানাই সামন্ত। কিন্তু তারপর? তারপর কী হল? বুধবারই তো ঘটনা ঘটবার কথা ছিল। কিছু কি ঘটল না?

দু–টাকার সার্টিফিকেটের পিছনে পড়ে থাকলে তো অফিসে দেরি হবেই।

কানাইবাবু টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, ও জিনিস আর খুঁজছি না। ওইটুকু টাকার জন্য এত খাটনি পোষাচ্ছে না। হারালে হারাক।

অটোতে উঠে কানাইবাবু পোস্টাপিসের সঞ্চয় সার্টিফিকেটের মতো ওই কাগজটির কথাও মাথা থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু দিতে কি পারলেন? সে কি গেল?

২

অফিসে আজ একটা উল্টো স্বভাবের কাজ করে বসেছেন কানাই সামন্ত।

বহুদিন ধরে 'করছি, করব' বলেও ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। মনস্থির করতে পারছিলেন না। একবার ভাবছিলেন করা উচিত, একবার ভাবছিলেন, করলে অফিসের কর্তারা যদি রেগে যান? যেতেই পারেন। মুখে না বললেও মনে মনে হয়তো বিরক্ত হবেন। ইনক্রিমেন্টের সময় সেই বিরক্তি যদি স্মৃতিতে থেকে যায়? তখন তো বিপদ। যদিও কাজ বিরাট কিছু নয়, একটা সই মাত্র। পিওন পরেশের মায়ের হয়েছিল অসুখ। পরেশ ছুটে গিয়েছিল দেশের বাড়ি। সেখানে মায়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে ফিরতে

সেই সময়ে তিনশো ছাপ্পান্ন––কম টাকা ছিল না। জমালে সে টাকা এখন সুদে–আসলে অনেকটা হয়ে যেত। টাকা জগন্নাথকে ফেরত দেওয়া হয়নি। যদিও কানাইবাবুর মনে ছিল, একটু বেশিই ছিল। জগন্নাথেরও যে মনে ছিল না এমন নয়। কয়েকবার চেয়েও ছিল সে।

দেখ না, যদি পারিস, দিয়ে দে। মায়ের কাছ থেকে জোর করে নিয়েছিলাম।

কানাইবাবু বলতেন, দেব, দেব, একেবারে সুদে–আসলে হিসেব করে ফেরত দেব।

একসময় জগন্নাথকে দেখলে দূর থেকে সরে যেতেন কানাইবাবু। জগন্নাথও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। কলেজ ছাড়বার পরও দেখা হয়েছে এক–আধবার। কানাইবাবু আগবাড়িয়ে বলেছিলেন, তোর টাকা তো বেড়ে গিয়েছে। একদিন দেখবি হুট করে সব মিটিয়ে দেব। একটা কাজকম্ম পেতে দে।

কানাইবাবু 'কাজকম্ম' পেলেও জগন্নাথের টাকা পাওয়া হয়নি। শনিবার ব্যাঙ্ক থেকে বেশ কিছু টাকা তুলে কসবা পৌঁছোলেন কানাই সামন্ত। বাড়ি খুঁজে পেতে সমস্যা হল। কলকাতায় পুরোনো বাড়ি আর ক'টাই বা আস্ত রয়েছে? জগন্নাথের জরাজীর্ণ একতলা বাড়িটি নিবুনিবু করে জ্বলছে। দরজা

খুললেন এক মহিলা।

কানাইবাবু খানিকটা থতমত খেয়ে বললেন, জগন্নাথ?

মহিলা বললেন, ও তো পাঁচ বছর আগেই... একেবারে হঠাৎ, একদিন রাতে... কোনও চিকিৎসা করাতে পারিনি... আমি ওর স্ত্রী।

কানাইবাবু ঢোক গিলে বললেন, ওহ্, আমি খবর পাইনি। বহু বছর কলকাতার বাইরে ছিলাম কিনা। আমি ওর বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়েছি।

ভিতরে আসুন।

কানাইবাবু নিচু গলায় বললেন, আজ নয়, অন্য একদিন আসব। আপনি বরং এই টাকাটা রাখুন। জগন্নাথের কাছ থেকে এক সময়ে ধার নিয়েছিলাম।

রবিবার সারাদিন ঘরে বসে কাটালেন। সোমবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ মামাতো দাদাকে দেখতে গেলেন কানাইবাবু। এ ধরনের কাজ তিনি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছেন। আত্মীয়-পরিজনের অসুখ-বিসুখের খবর শুনলে এড়িয়ে যান। শুনতেই চান না। এক তো দেখতে যাওয়ার ধকল, দ্বিতীয়ত ফলটল কেনবার খরচ থাকে। চিকিৎসার খরচ চাইলে তো সর্বনাশ। তেমন অভিজ্ঞতাও আছে। টাকা আনছি বলে পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে হয়েছে। এই মামাতো দাদার সঙ্গে কানাইবাবুর গত এক বছর কথাও হয়নি। তারপরেও অফিস থেকে ফিরে, কল্যাণীর কাছ থেকে খবর পেয়ে, জামাকাপড় না বদলেই বেরিয়ে পড়লেন। কল্যাণী এতটাই অবাক হলেন যে কিছু বলতেও পারলেন না। ট্রামে উঠে কানাইবাবু নিজেও অবাক হলেন। নেমে যাবেন? সেটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত না কি? হত তো বটেই। তারপরেও কানাইবাবু মন শক্ত করে হাসপাতালে পৌঁছোলেন। রাতে স্বামীর ফোন পেলেন কল্যাণী।

তুমি খেয়ে নিও। জানি না কখন ফিরব। দাদার অবস্থা ভালো নয়, রক্ত লাগবে। ছোটাছুটি আছে।

কল্যাণী ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, হ্যাঁ গো, তুমি ঠিক আছো তো? তোমার কিছু হয়নি তো?

কানাই সামন্ত শান্তভাবে বললেন, বুঝতে পারছি না।

পরদিন, মানে মঙ্গলবার রাতে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা গত ষোলো বছরে এ বাড়িতে ঘটেনি। রাতের খাওয়া শেষ। বারান্দায় স্ত্রীকে ডাকলেন কানাইবাবু।

বসো কল্যাণী।

কল্যাণী অবাক হয়ে বললেন, এত রাতে!

কানাইবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, রাত তো কী হয়েছে? স্বামী-স্ত্রীর রাতে বারান্দায় বসা নিষেধ নাকি?

কল্যাণী ভয় পেয়ে বললেন, কিছু বলবে?

কানাইবাবু হেসে বললেন, না, কিছু বলব না, শুনব। তোমার গলায় একটা গান শুনব। কতদিন শুনিনি বলো তো। ওই যে গানটা গুনগুন করো... কী যেন? আরে ওই যে... আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ... তারপর আর মনে নেই... প্লিজ...।

কল্যাণী নিচু গলায় গান গাইতে গাইতে ঠিক করলেন, কাল স্বামীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। মাথা গরম হলে মানুষ নাকি নানা রকম কাণ্ড করে। এই লোকের মাথা গরম হয়নি তো?

কানাই সামন্ত কোনও মহামানুষ নন যে বুধবারের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী মঙ্গলবার রাতে ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমোবেন। যতই মাঝামাঝি-মানুষটা উল্টো অসুখে জড়িয়ে পড়ুক না কেন, যতই মাথার ভিতরের ঝাঁকুনি ধমক দিয়ে সব চিন্তা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বলুক না কেন, ভয় হবেই। মৃত্যুভয় বড় তীব্র। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমন্ত স্ত্রীর পাশে কানাইবাবু জেগে রইলেন।

পরদিন ঘুম ভাঙল বেলা করে। চোখ খুলেই কানাইবাবু তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসসেন। অস্ফুটে বলে ফেললেন, যাক্ এখনও বেঁচে আছি।

কিন্তু গোটা দিনটাই যে পড়ে রয়েছে। কানাইবাবু ভাবলেন, থাকুক পড়ে। যা খুশি হোক। আজ কাজ অনেক। অফিসে জরুরি মিটিং, জোর ঝগড়া করতে হবে। তারপর যেতে হবে মধ্যমগ্রাম। সহকর্মী রত্নাদির বড় মেয়েটি হায়ার সেকেন্ডারিতে রেজাল্ট খারাপ করে খুব আপসেট। ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। খরবটা শুনে কানাইবাবু আগবাড়িয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন।

কাল আপনার সঙ্গে যাব। ওই মেয়েকে কত ছোট দেখেছি। ধমক দিয়ে মন ভালো করে দেব। বুঝিয়ে বলতে হবে, একটা পরীক্ষার রেজাল্টই জীবন নয়।

রত্না রাজি হয়েছেন। ফলে আর শুয়ে থাকলে চলবে না, বিছানা ছাড়লেন কানাই সামন্ত। কিন্তু তারপর? তারপর কী হল? বুধবারই তো ঘটনা ঘটবার কথা ছিল। কিছু কি ঘটল না?

অবশ্যই ঘটল। বৃহস্পতিবার শহরের কিছু খবরের কাগজের ভিতরের পাতায় ছোট করে একটি খবর বেরোল। চোখে না পড়বার মতোই খবর। সেখানে লেখা হয়েছে, বুধবার দুপুরে এক বৃদ্ধার প্রাণ বাঁচালেন এক অফিসযাত্রী। চলন্ত ভিড় বাসে উঠতে গিয়ে বৃদ্ধা পা হড়কে চাকার তলায় পড়ে যাচ্ছিলেন। মাঝবয়সের সেই যাত্রী ছিলেন দরজার কাছে। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বৃদ্ধাকে একরকম জাপটে ধরেন। জানা গিয়েছে, সেই যাত্রীর নাম...।

বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন কানাইবাবু। কাগজ সরিয়ে রেখে হাঁক দিলেন।

কল্যাণী চা কই? চা খেয়ে পোস্টাপিসের সার্টিফেকেটটা খুঁজব খানিকক্ষণ। আজ বৃহস্পতিবার হয়ে গেল, কাল-পরশু জমা দিতেই হবে।

তুলিকলা: **শ্রীতমা রক্ষিত**

তুমি

সিজার বাগচী

কলেজ জীবন থেকে লেখালিখি। আড়াই দশকেরও বেশি সাংবাদিকতার পেশায়। বর্তমানে 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সম্পাদক। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও কলমে আসে নিবন্ধ, প্রচ্ছদকাহিনি, চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনি, কথিকা প্রভৃতি। গ্রন্থ সম্পাদনা সহ করেছেন ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ। বাংলা আকাদেমির সোমেন চন্দ স্মারক সম্মান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইলা চন্দ সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত।

তিনদিন বাদে বাড়ি বদল। কলকাতার নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাচ্ছে অরিন্দম–সৃজা। এদিকে জিনিসপত্র গোছানো হয়নি। সকাল থেকে দু'জন লেগেছে সেই কাজে।

অরিন্দম তেমন পারে না। সৃজা যা করার করছে। সঙ্গে নিয়েছে কাজের লোক মালতিদিকে। বাড়িতে ওরা দু'জন থাকে। তবু জিনিসপত্র কি কম? একদিনে কতটুকুই বা সৃজা গোছাতে পারবে? ঠিক হয়েছে, প্রথমে বিছানাপত্র, কিছু জামাকাপড় নেবে। এক মাস বাদে ছুটি নিয়ে দ্বিতীয় খেপে বাকি মাল।

অরিন্দমকে একটাই দায়িত্ব দিয়েছে সৃজা। চিলেকোঠার ঘরের বই–পত্রিকা–বাছাই করা খবরের কাগজ পিচবোর্ডের বাক্সে পোরার। সেই কাজ করতে এসেছে অরিন্দম।

চিলেকোঠার ঘরে এসে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মন খারাপ। কবেকার বাড়ি! দাদু একতলা করেছিলেন। বাবা করেছিলেন বাকিটা। এখন তাঁরা কেউ নেই। তবু বাড়ির প্রতি কোণে তাঁদের স্মৃতি। চিলেকোঠার ঘর ছিল অরিন্দমের আস্তানা। কত এখানে দুপুর কাটিয়েছে। বই পড়েছে। কবিতা লিখেছে।

এই ঘরে অনেকগুলো জানলা। তেমনই এক জানলার ধারে ও এসে দাঁড়াল। সামনে চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। সেখানে জামাকাপড় শুকোচ্ছে। তিনতলার বারান্দায় বৃদ্ধ সান্যালবাবু বসে। অরিন্দম ঠায় তাকিয়ে থাকল। ওই জায়গায় আগে ছিল ঘোষালদের বাড়ি। সামনে ছিল দুর্গাদালান। বাগান। বাড়ি বিক্রি করে ঘোষালেরা বছর সাতেক হল চলে গিয়েছে। সেই জমিতে গড়ে উঠেছে কৃষ্ণা অ্যাপার্টমেন্ট।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অরিন্দম। এভাবে একদিন ওদের আড়াইতলা বাড়িও বিক্রি হয়ে যাবে। টালিগঞ্জ থেকে নিয়মিত বৈদ্যবাটি আসা কি সম্ভব? প্রথম প্রথম টান থাকবে। কিছুদিন বাদে ওদিকে যখন থিতু হবে, তখন টান আলগা হয়ে পড়বে।

জানলা থেকে সরে এল অরিন্দম। কাজে নামল। হাতে সময় কম। একটা পিচবোর্ডের বাক্সের ডালা খুলে ও গিয়ে দাঁড়াল বইয়ের আলমারির সামনে। প্রথমে পত্রিকাগুলো বাক্সে পুরতে লাগল। প্রথম বাক্স ভরে গেল। এবার দ্বিতীয় বাক্স। আলমারি থেকে আরও পত্রিকা নিতে গিয়ে ওর হাতে মোটা কিছু একটা ঠেকল। ও জিনিসটা টেনে বের করল। একটা ডায়েরি। এক সময় রং ছিল গাঢ় সবুজ। এখন কালচে।

ডায়েরিটার দিকে ও হতবাক হয়ে চেয়ে থাকল। ভুল না হলে এটা ওর কলেজ জীবনের। অনেক খুঁজেও যা পাওয়া যায়নি। অরিন্দম তাড়াতাড়ি ডায়েরির হলদেটে পাতা ওলটাল। প্রচুর ধুলো জমে খাঁজে খাঁজে। পাতা ওলটাতেই ও বুঝতে পারল ভুল হয়নি। এই ডায়েরির পাতায় পাতায় লেখা ওর কলেজ জীবনের অনেক কবিতা। কয়েকটার নীচে লেখার তারিখও দেওয়া।

অরিন্দম মাটিতে থেবড়ে বসল। এই কবিতাগুলোয় ধরা ওর দশ বছর আগে ফেলে আসা জীবন। যে জীবনের সব কথা কাউকে কখনও বলেনি। সৃজাকেও নয়।

অরিন্দম পড়তে লাগল কবিতাগুলো। কবিতা ঠিক নয়। ছোট ছোট অনুভূতি। যে অনুভূতি রোজকার কাজের চাপে আর এখন জেগে ওঠে না। অরিন্দম ধরে নিয়েছিল, এই ডায়েরি হারিয়ে গিয়েছে। এখন যখন, পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন ঠিকানার দিকে পা বাড়াচ্ছে, তখন কবিতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে ও যেন উপলব্ধি করল, জীবনের কোনও কিছু বোধহয় হারিয়ে যায় না। কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে থাকে। এক বিশেষ মুহূর্তে বেরিয়ে আসে।

এমন সময় সৃজার হাঁক ভেসে এল, চা খাবে?

চমকে উঠল অরিন্দম। সৃজা এল নাকি? তারপর বুঝতে পারল, সৃজা দোতলার সিঁড়ির সামনে থেকে ডাক দিয়েছে। ওপরে ওঠেনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে অরিন্দম জবাব দিল, খাব।

তা হলে ডাকলে এসে নিয়ে যেও, জানাল সৃজা।

অরিন্দম উত্তর দিল না। ডায়েরির দিকে মন দিল। প্রথমে ও কবিতা লিখত সাদা দিস্তা কাগজে। সংঘমিত্রার দেখাদেখি ডায়েরিতে লেখা শুরু করেছিল। কথাটা ভাবতেই কবিতাগুলো থেকে জুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে এল। সংঘমিত্রা গন্ধ। এখনও নাক টানলে সেই গন্ধ পায় অরিন্দম। এই ডায়েরির কত কবিতায় যে সংঘমিত্রা মিশে!

চোখ বন্ধ করে অরিন্দম দেখতে পেল শ্রীরামপুর কলেজের প্রাচীন ইমারত। বিরাট গেট। গেটের সামনে চওড়া রাস্তা। রাস্তার পাশে গঙ্গার দিক থেকে ভিজে হাওয়া উড়ে আসছে। সেই হাওয়ায় উড়ছে সংঘমিত্রা চুল। উড়ছে ওর ওড়না। ডানার মতো কাঁধের দু' পাশ দিয়ে। রাস্তায় বিছানো কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া ফুল।

অরিন্দম বিভোর হয়ে তাকিয়ে মেয়েটার দিকে। ওর দিকে চোখ পড়তে সংঘমিত্রা হাত নাড়ল। কাছে এসে হাসল। অরিন্দম দেখল সংঘমিত্রার ডান গালে টোল পড়ে। মেয়েটার পাতলা ঠোঁট। পিঠ ছাপানো চুল থেকে আসছে জুঁই ফুলের গন্ধ।

ওই গন্ধ অরিন্দমের কাছে ভালোবাসার গন্ধ হয়ে দাঁড়াল। শুধু ভালোবাসা? ভুল। প্রেম এবং কাম সবে মিশেছিল জুঁই ফুল। কলেজ ছাড়ার বহু বছর পর একবার যাদবপুর থেকে বাসে উঠে ও সামনের মহিলার চুলে পেয়েছিল অবিকল সেই গন্ধ। বাসের দুলুনিতে গন্ধটা নাকে এসে লাগতেই অরিন্দমের মনে হয়েছিল, সংঘমিত্রা বুঝি এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। সেই ফিনফিনে শরীর। অল্প ঢেউ খেলানো বুক। সরু

কথাটা ভাবতেই কবিতাগুলো থেকে জুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে এল। সংঘমিত্রা গন্ধ। এখনও নাক টানলে সেই গন্ধ পায় অরিন্দম। এই ডায়েরির কত কবিতায় যে সংঘমিত্রা মিশে!

সরু আঙুল। গোলাপি নখ। বাসের মধ্যে ও প্রায় বেসামল হয়ে পড়ছিল।

শুধু কি সেই একবার? সৃজার সঙ্গে ফুলশয্যার বিছানায় এসে অরিন্দম পেয়েছিল জুঁই ফুলের গন্ধ। বোধহয় ফুলশয্যার খাট যে লোকজনেরা সাজিয়েছিল, তারা আরও ফুলের সঙ্গে জুঁই ফুলও রেখেছিল। সেই গন্ধ নাকে যেতে অরিন্দমের অবস্থা হয়েছিল মহুয়ার গন্ধে মাতোয়ারা ভালুকের মতো। দরজা বন্ধ হয়ে আলো নিভতেই ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সৃজার ওপর। পরদিন ঘুম ভাঙার পর সৃজার সেকি মিটিমিটি হাসি! এখনও সেই রাতের কথা মনে পড়লে সৃজা বলে, সেদিন তুমি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। তার আগে কখনও তোমায় দেখে বুঝিনি, তুমি অমন।

সৃজাও কি কোনও দিন জানবে, ফুলশয্যার রাতের সেই উন্মাদনার রহস্য! অথচ সংঘমিত্রার সঙ্গে তেমন শরীরী সম্পর্ক ওর কোনওদিন হয়নি। হাতে হাত ধরেছে অনেকবার। চুমু খেয়েছে। তার বেশি এগোয়নি।

ডায়েরির পাতায় হাত বোলাল অরিন্দম। এখন

ও জানে, এই লেখাগুলো আদৌ কবিতা নয়। কাঁচা আবেগ। তাই নিয়ে কি কম মাতামাতি করেছে? নাকি কবিতা হয়নি বলে আবেগের কোনও দাম নেই?

অরিন্দম দেখতে পেল, শ্রীরামপুর কলেজের সেই ছ' থামওয়ালা বিল্ডিংয়ের সামনের সিঁড়িতে বসে ওরা সাত-আটজন। সংঘমিত্রা, অবির, সোমা, রাজশ্রী, সুদীপ্ত, অতনু, দেবারুণ, স্বর্ণালী। কেউ ইংরেজি অনার্স, কেউ ফিজিক্স অনার্স, কেউ আবার বি কম পাস। সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছে ওদের চটি কবিতা পত্রিকা। 'সূত্রপাত'। পত্রিকা গোষ্ঠীতে অরিন্দমকে এনেছিল আবির। আবির ছাত্র রাজনীতি করত। এবং ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কবিতা লিখত।

সূত্রপাতের সূত্রে ওর আর সংঘমিত্রার পরিচয়। এবং সম্পর্কের সূত্রপাত।

কলেজে পড়ার সময় অরিন্দম বেজায় লাজুক ছিল। কয়েকজন বন্ধু মিলে ব্যান্ড খুলেছিল। ওর গানের গলা মন্দ ছিল না। কিন্তু মঞ্চে উঠে গান গাইবার কথা ও ভাবতে পারত না। কলেজের বিতর্কসভা কিংবা অন্য অনুষ্ঠানে আয়োজক হিসেবে থাকলেও, অংশগ্রহণ করেনি কখনওই। বরং আড়াল খুঁজেছে। কবিতা পত্রিকার সঙ্গে জুড়তে পেরে ও বড় আরাম

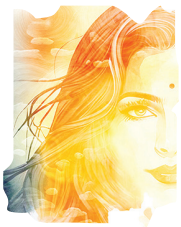

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'কেন কাঁদছি? হিন্দোল আর ফিরবে না!' উত্তর পেলাম, হিন্দোলের জন্য আমি কাঁদছি না। কাঁদছি ভালোবাসার জন্য। কেউ আমাকে ভালোবাসেনি। সেই দুঃখ থেকে কাঁদছি।

পেয়েছিল।

সংঘমিত্রাই কি ওর জীবনে আসা প্রথম নারী? সেটা বলা যাবে না। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় ওদের ব্যাচের দিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল অরিন্দমের। সুবীরস্যারের পড়ানোর শেষে অরিন্দমের বেরোতে দেরি হলে দিয়া অপেক্ষা করত। ও পড়তে না গেলে নিজের নোটস দিত। অরিন্দমও তাই করত। মাসের পর-মাস এটা চলতে থাকায় বন্ধুরা ধরে নিয়েছিল, দু'জনে প্রেম করছে। অরিন্দম এক-দু' বার ভুল ভাঙতে চেয়েছিল। কেউ আমল দেয়নি। দিয়াও কি ভাবেনি? না হলে ক্লাস ইলেভেনে যখন চিকেন পক্স হল, তখন ছোঁয়াচে রোগ জেনেও কেন রোজ আসত ওর কাছে? খানিক দূরে বসে কেন শোনাত রোজকার পড়া?

মায়ের খুব পছন্দ ছিল দিয়াকে। প্রায়ই বলত, ভারি মিষ্টি মেয়ে।

দিয়াদের পরিবারও ছিল ভালো। ওর বাবা ব্যাংকে চাকরি করত। মায়ের গানের স্কুল ছিল। দিয়া ছিল এক মেয়ে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও দিয়াকে প্রেমিকা মনে হয়নি অরিন্দমের। কেন? সঠিক জবাব ওর কাছে ছিল না। অরিন্দম শুধু টের পেত, দিয়ার শরীরে জুঁই ফুলের গন্ধ নেই। তখন অবশ্য এত ছোট ছিল যে, জুঁই ফুলের গন্ধ যে কী ও আবিষ্কার করতে পারেনি। তবু না-থাকাটা ধরা পড়ত ওর অনুভবে।

দু'জনে কোনওদিন প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কথা বলেনি। পরস্পরের গায়ে পড়েনি। হাত ধরেনি। তবু দিয়া ধরে নিয়েছিল অরিন্দম ওরই। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর অরিন্দম যখন আর যোগাযোগ রাখল না, তখন বোধহয় দিয়ার প্রথম খটকা লেগেছিল। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর সব বন্ধুরা সুবীরস্যারের বাড়িতে দেখা করল। অরিন্দম তখনও নির্বিকার। আলাদা করে দেখা করা কিংবা কথা বলার চেষ্টা করেনি। সেদিন দিয়া যা বোঝার বুঝে ফেলেছিল। অরিন্দমের সাড়া না দেওয়ায় ও কোনও অভিযোগ করেনি। কেবল নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়েছিল। আর অরিন্দমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি।

সংঘমিত্রার সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাদা করে দেখা করেছিল, সেদিন দিয়ার কথা বলেছিল অরিন্দম। দু'জন বসেছিল টেক্সটাইল কলেজের সামনের পার্কে। সামনে নদী।

সংঘমিত্রা কিছু বলেনি। বরং ও জানিয়েছিল হিন্দোল প্রসঙ্গে। সেই ক্লাস নাইন থেকে হিন্দোলের সঙ্গে সংঘমিত্রার সম্পর্ক ছিল। দু'জন পড়ত মেথাডিস্ট হাই স্কুলে। কিন্তু আইএসসি পরীক্ষার পর হিন্দোল স্রেফ ওকে ঝেড়ে ফেলে চলে গিয়েছিল আহিরির হাত ধরে। যাওয়ার আগে বলেছিল, তুই একটু ঠাকুরমা টাইপস। আমার চলবে না।

অল্প হেসে সংঘমিত্রা ব্যাখ্যা করেছিল, তখন বাংলায় কবিতা লেখা শুরু করেছি। কয়েকটা ওকে পড়িয়েছিলাম। হিন্দোলের একেবারে ভালো লাগেনি। কিন্তু কী করব বল? আমার যে লিখতে ভালো লাগে!

অরিন্দম চুপ করে থেকেছিল। যাকে ভালোবাসে সে যদি পুরোনো প্রেম নিয়ে আক্ষেপ করে, সেটা শোনা যে কত কষ্টের, তা কি বলা যায়?

সংঘমিত্রাও কোনও কথা বলেনি কিছুক্ষণ। এক সময় ফের বলেছিল, প্রথমে খুব কাঁদতাম। ডায়েরি খুলে বসে যেতাম কবিতা লিখতে। অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখ, যে কবিতার জন্য হিন্দোল আমায় ছেড়ে চলে গেল, হিন্দোলের কথা মনে পড়লে আমি সেই কবিতার কাছে ফিরে ফিরে আসতাম। এক সময় নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'কেন কাঁদছি?

হিন্দোল আর ফিরবে না!' তখন কখন যেন উত্তর পেলাম, হিন্দোলের জন্য আমি কাঁদছি না। কাঁদছি ভালোবাসার জন্য। আমি যা সেটা জেনে, সেটাকে মেনে নিয়ে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি। সেই দুঃখ থেকে কাঁদছি।

সংঘমিত্রার কথায় এমন কিছু ছিল যে, অরিন্দম হাত বাড়িয়ে ওর হাতে রেখেছিল। সংঘমিত্রা সেই হাত সরিয়ে নেয়নি। মুঠোয় চেপেও ধরেনি। রাতে বাড়ি ফিরে এই ডায়েরির পাতায় প্রথম কবিতা লিখেছিল অরিন্দম। দিনকয়েক বাদে আবার যখন দু'জন ফাঁকায় এসে বসেছিল, তখন সেই কবিতা শুনিয়েছিল সংঘমিত্রাকে।

নদীর দিকে মুখ করে সংঘমিত্রা সেই কবিতা শুনেছিল। অল্প হেসে বলেছিল, সেদিন রাতে আমিও একটা কবিতা লিখেছি। তোকে নিয়ে।

চা নিয়ে যাও! সৃজার হাঁকে হুঁশ ফিরল অরিন্দমের।

ডায়েরি রেখে ও উঠে দাঁড়াল। নীচে নেমে দেখল সিঁড়ির মুখে সৃজা দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ।

অরিন্দম কাপ নিতে নিতে বলল, কাজ কত দূর?

কিছুটা গুছিয়েছি।

আজেবাজে জিনিস থাকলে ফেলে দেবে। ফ্ল্যাটে জায়গা কম।

জানি, চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল অরিন্দম, বেছে বেছে নিচ্ছি।

সৃজা চলে গেল একতলার জিনিস গোছাতে। অরিন্দম উঠে এল চিলেকোঠায়। ডায়েরি ভরে নিল বাক্সে। এখনও অনেক কাজ করতে হবে। এইটুকু কাজও যদি সময়ে না হয়, সৃজা রেগে যাবে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ও আলমারি থেকে আবার একগোছা পত্রিকা বের করল। সবই কলেজ যুগের লিটল ম্যাগাজিন। সব পত্রিকায় ওর কবিতা বেরিয়েছে। এক ধারে ও পত্রিকাগুলো রাখল। নতুন ফ্ল্যাটে কবিতা পত্রিকাগুলো আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে হবে। আর তো কোনওদিন কবিতা লেখা হবে না। সেই বয়স পেরিয়ে এসেছে। এই স্মৃতিটুকু সম্বল।

আলগোছে ও পত্রিকাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক বছরের কলেজ ম্যাগাজিন। চায়ের কাপ নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে ও পত্রিকাটা তুলে নিল। দীর্ঘদিন চাপা থাকতে থাকতে পত্রিকার পাতাগুলো ধূসর হয়ে গিয়েছে। ও একের পর-এক পাতা ওলটাতে লাগল। প্রথমে কয়েকটা প্রবন্ধ। বেশির ভাগ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। একটা ভ্রমণও চোখে পড়ল। এরপর কবিতা বিভাগ। সেই পাতায় পৌঁছে দেখল অনেকের কবিতা ছাপা হয়েছিল। আবির, সোমা, রাজশ্রী, সুদীপ্ত, দেবারুণ। এবং সংঘমিত্রা। 'তুমি' কবিতাটার নীচে জ্বলজ্বল করছে সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের নাম। দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরেজি অনার্স।

ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রণতোহস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥
যিনি দেবাদিদেব মহাদেবের বিভূতি স্বরূপিণী, ঈশ্বরী, মহাদেবের পত্নী, যিনি সংসার সাগর থেকে আমাদেরকে দয়া করে উত্তীর্ণ করেন সেই দেবী দুর্গাকে সর্বদা প্রণাম করি।

কবিতাটার দিকে তাকিয়ে থাকল অরিন্দম। সেই কবিতার গভীরে ও দেখতে পেল শ্রীরামপুর কলেজের বিরাট মাঠ। সেই মাঠের ধারে বড় বড় গাছের নীচে ওরা আড্ডা দিচ্ছে। সামনে কলেজ ম্যাগাজিন বেরোবে। ছাত্র সম্পাদক আবির। প্রায় সবাই লেখা জমা দিয়েছে। আবিরই চেয়ে চেয়ে নিয়েছে। অরিন্দম এবং সংঘমিত্রার কবিতাও জমা আছে।

সেদিনের আড্ডা ছিল সূত্রপাতের পরের সংখ্যা নিয়ে। এমন সময় আবির এসে হাজির। মুখ গম্ভীর।

আবির এসে ধপ করে বসে পড়ল। বলল, তোদের সবার কবিতাই যাচ্ছে এবার। শুধু অরিন্দম আর সংঘমিত্রার কবিতা ছাড়া।

কেন? ওরা বাদ কেন? সোমা প্রশ্ন করল।

অর্ধেন্দুবাবুর পছন্দ হয়নি ওদের কবিতা। আমি কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। স্যার মানছেন না। তবে আজ বুধবার। স্যার বলেছেন, সোমবারের মধ্যে যদি দ্বিতীয় কবিতা দিতে পারে, তা হলে চান্স আছে।

অরিন্দম লক্ষ করল সংঘমিত্রার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। তাই ও বলল, ঠিক আছে। আমরা সোমবারের মধ্যে আবার কবিতা দেব।

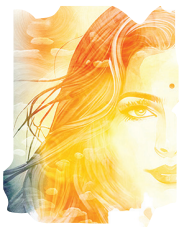

স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অরিন্দম হাত ধরল সংঘমিত্রার। সেই ফাঁকা রাস্তায় ও চুমু খেল সংঘমিত্রাকে। নরম গলায় বলল, আর একটা কবিতা দে। সংঘমিত্রা হাসল। বলল, যথেষ্ট অপমান এখনও হয়নি বলছিস?

আবির পিঠ চাপড়ে বলল, দ্যাটস দ্য স্পিরিট। দে। আমি চাই, তোদের সবার কবিতা থাকুক। সেদিনের আড্ডা বিশেষ জমল না। বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে সংঘমিত্রা কেঁদে ফেলল। অরিন্দমেরও খারাপ লেগেছিল। কিন্তু অতটা নয়। সংঘমিত্রার পিঠে ও হাত বোলাতে লাগল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সংঘমিত্রা বলল, ভেবেছিলাম, একটা কবিতা অন্তত কলেজ ম্যাগাজিনে যাক। সেটা হবে আমার স্মৃতি!

আরে, সুযোগ তো চলে যায়নি। তুই আবার লেখ। সময় আছে তো।

এভাবে আর লিখতে পারব না। লিখলেও সেটা ভালো হবে না। আজ রাতে বাড়ি ফিরে কবিতা নিয়ে বোস। ঠিক পারবি।

সংঘমিত্রা নিমরাজি হয়ে বাড়ি গেল। পরদিন এসে জানাল, একটা কবিতা লিখেছে। সেটা ঘষামাজা করতে হবে। অরিন্দমও লিখেছে। ও-ও চাইছে সেটা কয়েকদিন ফেলে রেখে আবার কাটাকুটি করবে। তারপর জমা দেবে।

সংঘমিত্রা অবশ্য দেরি করেনি। পরের দিনই আবিরের হাতে নিজের দ্বিতীয় কবিতা ধরিয়ে দিয়েছে। আবির তখন অরিন্দমের কাছে জানতে চাইল, তোর লেখার কী খবর?

এখনও হয়নি। সোমবার দেব।

কিন্তু পরদিন আবির হতাশ মুখে ফের হাজির ওদের কাছে। বলল, এবারও হল না মিত্রা। অর্ধেন্দুবাবু এবারও রিজেক্ট করে দিয়েছেন।

সংঘমিত্রার মুখ কালো হয়ে গেল। অরিন্দম মনে মনে প্রমাদ গুনল। আড্ডা ভাঙার পর শ্রীরামপুর স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অরিন্দম হাত ধরল সংঘমিত্রার। তখন সন্ধে হব হব। রাস্তা ফাঁকা। সেই ফাঁকা রাস্তায় ও চুমু খেল সংঘমিত্রাকে। নরম গলায় বলল, আর একটা কবিতা দে।

সংঘমিত্রা হাসল। বলল, যথেষ্ট অপমান এখনও হয়নি বলছিস?

অপমান হল ধুলোর মতো। ঝেড়ে ফেললেই হয়। অনেক বড় কবিকে অপমান ঠেলে নিজের কবিতা প্রকাশ করতে হয়েছে।

আমি বড় কবি নই অরিন্দম। কোনও দিন হব না। আমি খুব সাধারণ কবিতা লিখি। তাই আমার কাছে কলেজ ম্যাগাজিনে একটা লেখা প্রকাশ হওয়া খুব বড় ব্যাপার। শখ বলতে পারিস। আমার সেই শখ পূরণ হবে না।

সেদিন রাস্তায় কেউ আর কোনও কথা বলল না। বাড়ি ফিরে সংঘমিত্রার কথাগুলো ঘুরতে লাগল অরিন্দমের মাথায়। কতজনের লেখা তো ছাপা হচ্ছে কলেজ ম্যাগাজিনে। শুধু সংঘমিত্রাই বাদ! এই নিয়ে তর্ক করাই যায়। কিন্তু অরিন্দম জানে, তর্ক করে লাভ নেই। হঠাৎ একটা রাস্তা ও দেখতে পেল।

পরদিন কলেজ গিয়ে ও ধরল সংঘমিত্রাকে। দিল সেই প্রস্তাব।

কিন্তু সংঘমিত্রা ছিটকে গেল। বলল, একেবারে নয়। আমি কেন তোর কবিতা নিজের নামে জমা দেব?

তুই আমি কি আলাদা?

সংঘমিত্রা অপলক ভাবে তাকাল ওর দিকে। বলল, নিজের লেখাকে এভাবে বিলিয়ে দিস না। সেটা লেখার অপমান।

বিলিয়ে দিচ্ছি কে বলল? যে আমার লেখার মূল অনুপ্রেরণা, যে আছে বলেই আমার লেখা আছে, তাকে দিচ্ছি। দুটো কি এক হল? আমি তোকে ভালোবাসি সংঘমিত্রা। আমার লেখার চেয়েও বেশি।

সংঘমিত্রা কোনও জবাব দিল না।

অরিন্দম বলল, কী হল? একটা ফুলস্কেপ কাগজ

বের করে টুকে নে!

সংঘমিত্রা তবু রাজি হল না। বলল, এটা উচিত নয়। নিজের যোগ্যতায় যদি পারি, তবে লেখা ছাপাব। না হলে...আবার সেই কথা! অরিন্দম ছটফট করে বলল, ঠিক আছে। এরপর একটা কবিতা লিখে দিস। সেটা আমি নিজের নামে ছাপিয়ে দেব। শোধবোধ।

হেসে ফেলল সংঘমিত্রা। অরিন্দম দেখল এই সুযোগ। তাই আরও কিছুক্ষণ সংঘমিত্রার মন ভিজিয়ে ওকে দিয়ে নিজের কবিতা টুকিয়ে নিল। সংঘমিত্রা কিছুতেই কবিতাটা জমা দিতে যেতে চাইছিল না। অরিন্দম গিয়ে আবিরের হাতে দিয়ে এল।

বিকেলে আড্ডায় এসে আবির বলল, সংঘমিত্রার 'তুমি' কবিতাটা সিলেক্টেড। অরিন্দম, এবার তোর কবিতা ছাড়।

অরিন্দম মাথা নাড়ল। বলল, হবে না।

মানে! সোমবার দিবি?

তা বলছি না। বলছি, লেখা দিতে পারব না।

সেদিন যে বললি...

বলেছিলাম। কিন্তু যেটা লিখেছি সেটা জমা দেওয়া যাবে না। পাতি। স্যার ফেলে দেবেন। তার চেয়ে না দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

সংঘমিত্রার কবিতা বেরিয়েছিল পত্রিকায়। শুধু তাই নয়, অনেকে প্রশংসাও করেছিল। এত বছর বাদে পুরোনো ম্যাগাজিনে সেটা পড়ে অরিন্দমের মনে হল, বোধহয় লেখাটা খারাপ লেখেনি।

ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ে চুমুক দিল অরিন্দম। সেই সংঘমিত্রা! কলেজ ছাড়ার পর কেরিয়ার, চাকরি এই সবের জেরে কবে যে ভেসে গেল মেয়েটা, তখন পুরোপুরি টের পায়নি। যখন পেল, তখন কেরিয়ারের স্রোত ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সুজার কাছে। এক সময় যে মেয়েকে মনে হয়েছিল নিজের কবিতার চেয়েও নিবিড়, বছর ঘুরতে সেই মেয়ের সরে যাওয়া তেমন হেলদোল তোলেনি ওর ভেতরে।

তবে সংঘমিত্রার খবর যে একেবারে রাখেনি তা নয়। শুনেছে, পুণেতে আছে ও। সেখানে ওর স্বামী চাকরি করে। কলেজ ছাড়ার পর এক-দু' বার দেখা হয়েছিল দু'জনের। তারপর আর হয়নি। তবু কলেজ ম্যাগাজিনের ওই 'তুমি' কবিতা জুড়ে রেখেছে দু'জনকে। ওদের দু'জনের কাছে যে দুটো কপি আছে, হয়তো একদিন সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তবু কলেজের লাইব্রেরিতে সংখ্যাটা থেকে যাবে। বরাবরের জন্য। হয়তো বহু বছর বাদে কেউ কোনও দরকারে ওই পত্রিকার পাতা ওলটাবে। চোখে পড়বে কবিতাটা। কিন্তু তারা জানবে না, 'তুমি' কবিতায় কেমন মিলেমিশে আছে অরিন্দম-সংঘমিত্রা। চিরকালের জন্য।

তুলিকলা: **শ্রীতমা রক্ষিত**

ওঁ ভগবতী ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নী চ কামদে।
কৌশিকি ত্বং মহেশানি কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥

যিনি স্বয়ং ভগবতী, যিনি আমাদের সকলের মনের ভয় দূর করেন, যিনি কাত্যায়নী, যিনি মনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই ইন্দ্রাণী পরমেশ্বরী কালিকাকে প্রণাম করি।

সম্পর্ক

সুবোধ সরকার

জন্ম অক্টোবর ২৮, ১৯৫৮ কৃষ্ণনগরে। শরণার্থী পরিবারের সন্তান। কৈশোরে পিতার প্রয়াণ। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। কবিতা পড়াতে গিয়েছেন আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, রাশিয়া, তাইওয়ান, ইস্তানবুল প্রভৃতি দেশে। সম্পাদনা করেছেন 'ভাষানগর' পত্রিকা, দিল্লির সাহিত্য অকাদেমির ইংরেজি জার্নাল 'ইন্ডিয়ান লিটারেচার'। অন্যান্য বহু পুরস্কার সহ ২০১৩-তে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি।

যে রাতে আমি তোমার ঘরে এসেছিলাম
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।

যে রাতে আমি অন্ধকারে, হারিয়ে গেছি তেপান্তরে
বললে তুমি এই তো আমি
তেপান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা তিল
তোমার চোখে আমার চোখে জল
সোনার দেশে তোমার আমার এইটুকুই তো মিল।

যে রাতে আমি তোমার ঘরে এসেছিলাম
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম
আকাশ ভাঙা বৃষ্টি ছিল
তোমার দিকে দৃষ্টি ছিল
দরজা বন্ধ করে সেদিন বসেছিলাম।

যে রাতে আমি তোমার ঘরে এসেছিলাম
সেদিনই সম্পর্ক শেষ হলে
মধ্যরাতে যেতাম চলে
অপমানিত, একা
দ্বিতীয়বার তোমার সঙ্গে হত না আর দেখা।

কিন্তু হলো
রাত্রি হলে যেমন করে তোমার চুল খোলো
তোমার চুলে তখন জ্বলে তারা
আমি যা চাই আমি কি তাই পাবো
আমি কি আর তোমার ঘরে যাব?

যে রাতে আমি তোমার ঘরে এসেছিলাম
না বলে ঘরে ঢুকতে নেই
লাল ঝিনুক খুঁজতে নেই
তুমি কি সম্পর্কে আছ আবহমান?
আসলে সম্পর্ক মানে একটি গান।

Best compliments from

Red Hot Chili Pepper

সর্বেষাং নাথভূতাসি ত্বমেবেকাকিনী যতঃ।
তস্মান্নমামি দেবেশি প্রসন্না বরদা ভব॥

তুমি একাই সকলের রক্ষা করো, তাই তুমি প্রণম্য। তোমাকে প্রণাম জানাই। হে দেবশ্রেষ্ঠা তুমি দয়া করে প্রসন্ন হয়ে বর দাও।

অন্ধকার চুম্বনেরস্বাদ

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমকালীন সাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১৬, উপন্যাস ২৪। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ দাঁড়াচ্ছি দরজার বাইরে, ছেড়েছি সব অসম্ভবের আশা, সম্ভবামি প্রভৃতি। সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর, মন্ত্র, ডার্বি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস, বিনয় মজুমদার, শর্মিলা ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার সহ বহু খেতাবে ভূষিত। আইওয়া আন্তর্জাতিক সাহিত্য শিবিরে বাংলা ভাষার প্রতিনিধি।

খাঁজ?
সময়,সূর্যাস্তেএসেবলেগেছেরোজ,
‘মরমরমর...’
সেই অভিশাপে আজ হয়েছি মর্মর।
মানচিত্র থেকে সব রাস্তা মুছে গেছে
পড়ে আছে ঘর।
মর...

কোথাও ছাপার ভুল ছিল কিনা, তা জানি না
‘মর’ হয়ে গিয়েছিল, ‘মদ’
গড়ে উঠেছিল জনপদ
দু’পাশে হাজারগণ্ডা বাড়ি
যে যার নিজের মতো করে মালগাড়ি
গতিতে মন্থর হোক
দুধ থেকে তুলে নেবে সর।
পড়ে থাকে জল তাতে রং দিলে পরে
নিউ-ইয়ার্স ইভ’এর পার্টি শহরে শহরে
বর্ষ বদলের রাতই শয্যা বদলের সন্ধ্যা
ঋতু বদলের মতো সঙ্গী বদলে বদলে যায়
হোটেলের তপ্ত বিছানায়...

যতক্ষণ থাকে
ফুলঝুরি ছুঁইয়ে রাখে, এ-ওর মৌচাকে
কী মিষ্টি আগুন
একদিন খেয়েছি বটে নুন...
তারপর ছোরা মেরে ক্যানভাসে দিয়েছি ঢেলে লাল
কামাল হো কামাল!
একটাই সাধ...
মাটির অতল থেকে
অজস্র কঙ্কাল এসে বলে যাবে, হে নিরপরাধ!
এই নাও প্রণাম
মুছে দিও আমাদের নাম
তোমাদের নখে লেখা ইতিহাসে চাই না উল্লেখ
ভিক্ষার জন্যই ধরি ভেক...
কিন্তু ভেক ধরতে ধরতে খেয়ালই থাকে না
ভেক কবে হয়েছে পোশাক,
সারিবদ্ধ মিথ্যা থাকথাক
দেখিয়েছে সারসের গলা
সুপারম্যানের মালা খোঁপায় বেঁধেছে বৃহন্নলা
আর সব সৈনিকেরা অস্থি-পাঁজরের মধ্যে চাপা দেওয়া মন
শয়তানে করেছে সমর্পণ...
রয়ে গেছে অঝোর আখ্যান
এই কৃষ্ণচূড়া আমি তোকে করলাম প্রত্যাখ্যান
দু’দিকে কলার তুলে তুই কত রং নিবি
রাধিকার রূপকথা রক্তে ভাসছে, দেখাল খবর
মর
পচে মর...

যে দেশ শ্মশানে ঘেরা
সেখানেও চাতকেরা
বৃষ্টির অপেক্ষা করে,
পাল্কি থেকে নেমে
বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ
আড়চোখে করে লক্ষ্য
কোন বেহারার মুখ উঠেছিল ঘেমে।
তারপর সংসার ডাকে
সাড়ে সতেরোশো পাকে
টানাপোড়েনের 'টান' যায় মোহানায়
হারিয়ে হয়েছি নিচু
পাহাড় ছাড়েনি পিছু
গলেছে বরফ হয়ে অন্তরে জমানো মৃত্তিকায়...

মাটিতে কংক্রিট পুঁতে মাটির চরিত্র বদলানো?
সে তো তুমি জানো।
গায়ে পেট্রোল ঢেলে দিবালোকে সন্ন্যাসী পোড়ানো?
তুমি তাও জানো।
তুমিও কি মানো—
ঐতিহ্য ধ্বসিয়ে দিলে সংস্কার তখনই নষ্ট
সংস্কার চুলোয় মানে পরম্পরা পথভ্রষ্ট
পরম্পরা গেল মানে কে অস্পষ্ট, কীবা স্পষ্ট?
কীটদষ্ট, কীটদষ্ট
অবিরাম শ্বাসকষ্ট
ফুসফুস বাতাস চেয়ে টেনে যাচ্ছে ছড়
এসে গেছে জ্বর?

গড়ে নাও ঘর।
ঘরগড়েনিতেপারলে
কল্পনাকবন্ধনয়
অন্ত্যমিলছন্দনয়,
মাচায়নাচা, না—নাচা
শৈল্পিকপ্রবন্ধনয়
উচিৎ—অনুচিত্তর্কে
অন্তর্দ্বন্দ্বঅন্ধনয়
কোনওপথবন্ধনয়
এমনকিবন্দিদশা
অবিমিশ্রমন্দনয়
বদরবদর&

দুপুরেনদীরজলরুপো—রুপোছিল
গোধূলিতেহয়েগেলসোনা
রাত্রিতাকেদেবেকষ্টিপাথরেররূপ
তারপরআমিবলবনা&
বলবেভেসেওঠামাছ
ফিরেআসাদুর্লভকচ্ছপ
একঠোঙামুড়িরমধ্যেফেলেদিলেপরে
কিছুফাঁসকরতেপারেচপ।
কথারাকিউইল?
কানেহাতদিয়েদেখো
আছেনাকিনিয়েগেছেচিল&
সত্যপীরজানবেন,
আসানহবেকিনামুশকিল
হায়দিল&

ভালবাসাভ্রান্তনয়
চূড়াইচূড়ান্তনয়
শান্তিনিজেশান্তনয়
বেদনাঅক্লান্তনয়
পাখিমাত্রেপান্থনয়
কবিতাবেদান্তনয়
কবিকৃষ্ণকান্তনয়
আপাততএটুকুইবলি

কেটেযাবেকলি&
খুলেযাবেপথ
ব্যর্থবাসফলযাইহোকমনোরথ
তুলোধুনতেধুনতেকিংবাউলবুনতেবুনতে
নয়তো
লাশগুনতেগুনতেআমরাসুখী
অন্ধকারচুম্বনেরস্বাদপাবেবলে
সূর্যডুবেগেলেপরেঘরেএসেছিলসূর্যমুখী&
করেছিলখোঁজ;
চিরদিন, চিরকাল
(আমাকেবিশ্বাসকরো)
সবকিছুএমনইসহজ।

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

পাহাড়ে একবার

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯.০৬.১৯৭৬। জন্ম কলকাতায়। ছোটবেলা কেটেছে বাটানগরে। ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক। উপন্যাস, গল্প ও কবিতা লেখেন। গত ছত্রিশ বছর দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা।

পাহাড়ে কুয়াশার বাড়ি পাইনের ফিতে দিয়ে ঘেরা
ওপাশে নামছে পথ, এপাশে লেপচার বসেরা

এলাচ গাছের পাশে বাঁক নিচ্ছে নীল টয ট্রেন
ভুটানী জামায রোদ আর কারো লাগলে বলবেন

ট্যুরিস্ট মাফলার উড়ছে, বাস স্ট্যান্ডে আজ বেশ ভিড়
পাহাড়ে সংসারী আসে, ফিরে যায দরবেশ, ফকির

কফি শপে সিট নেই। দরদাম করছে দোকানী।
আমরা ফুলের থেকে রডোডেনড্রন ছিঁড়ে আনি

সাইট সিন শুরু হল, ওই দূরে বাঁক নিচ্ছে গাড়ি
দুপাশে সবুজ গাছ ফাঁকে ফাঁকে লাল নীল বাড়ি

ঢালু দিয়ে নেমে গেলে শোনা যাচ্ছে চ্যাপেলের গান
ভোরবেলা যীশু এসে এইখানে পিযানো বাজান

এসব পেরিয়ে যাও, ঝর্ণার হাওযা লাগবে গাযে
বুনো গোলাপের রঙ, ঝাউ ফল নানান উপাযে

তোমাকে দেখাবে ঠিক কী হাওয়ায় বৌদ্ধ পতাকা
উড়ছে নিজের মতো... তার পাশে চুপ করে থাকা

একটি একলা পাখি সারাদিন খুঁজছে তোমাকে
যেভাবে নির্জন লোক মনে মনে পাহাড়কে ডাকে

তুমি শুনবে না জানি, পাহাড়ে কুয়াশা বাড়বে, ঘন
তারাই জমাবে ভিড় যারা পাখি বোঝে না কখনও

চিৎকার করবে তারা, চিপস আর গেলাসের কাচ
ঢেকে দেবে পাখিডাক। মুছে দেবে নরম এলাচ...

একাই থাকবে বাড়ি, বৃথা যাবে পাইনের ফিতে
রঙিন জানলার কাচ আবছা হবে পাহাড়ীয়া শীতে

কুয়াশায় ডুবে ভেসে ক্রমে সব মুছে যাবে, ভাবি...
সমতলে রোদে জলে তাও আমি ধরে রাখি দাবি

ছুটির রোদ্দুর ঘিরে আজও চাই এমন পাহাড়
যেখানে বালক আমি আর তুমি বালিকা আবার

তুলিকলা: শ্রীতমা রক্ষিত

ভাঙন

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৩। বাবা ফরিদপুর, মা রাজশাহী। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বিজয়গড়ের রিফিউজি কলোনিতে বাবার জন্ম। লেখকেরও বড় হওয়া বিজয়গড়েই। অভিনেতা হিসেবে 'রাহুল' নামে পরিচিত। আশৈশব গল্পের বইয়ের পোকা। বাবা বিজন ভট্টাচার্যের ছাত্র। সেই সুবাদে তিন বছর বয়সেই স্টেজে হাতেখড়ি। অভিনয় শুরু তখন থেকেই। কয়েকশো নাটক এবং সিনেমায় অভিনয় করেছেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একাধিক।

শরতের সঙ্গে বাঙালির উদযাপনের অমোঘ সম্পর্ক। অতি বড় রাম গরুড়ের ছানাও স্বীকার করবে যে ঢাকের আওয়াজ শুনলে রক্তস্রোতে দামামা বাজে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণী কুমার পৃথিবীর যে কোনো হ্যাং ওভার কাটিয়ে দিতে পারেন নিমেষে, ঠিক এই সময়ই। বাংলা এখন নতুন জামায় সারা আকাশ গায়ে দিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে। তার মধ্যে মূর্তিমান মুখভার মেঘ হয়ে এল যাদবপুর কফি হাউস বন্ধ হওয়ার খবরটা। না,কলেজ স্ট্রিটের কৌলীন্য কোনও দিনও তার ছিল না। তবু নিজস্ব অহংকারী দারিদ্র্যের আলো তাকে

Best compliments from

Indyvogue

ইয়ং সর্বেশ্বরীপূজা, যন্মায়া দেবি তে কৃতা।
পূর্ণা ভবতু সা সর্বা ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥
হে দেবী আমি সর্বেশ্বরীর পূজা করলাম। হে মহেশ্বরী
এই পূজা পূর্ণ হোক তোমার অনুগ্রহে।

জড়িয়ে ছিল এতগুলো বছর। কিন্তু আজকের এই শহরে বয়স্ক চাকচিক্যহীন প্রতিষ্ঠান, বাড়ি, মানুষ কারো জায়গা নেই। এই শহরটা মেঘে ঢাকা তারার শেষাংশের সেই সদ্য সমৃদ্ধ পরিবারটির মতো, যেখানে যা কিছু রিল-এর যোগ্য নয় তা-ই ছোঁয়াচে ওই টিবি রুগি বোনটির স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। তা সে যতই গরিব শহরের পেসমেকার হোক, তাকে স্বীকার করা মানে নিজের চেনা, লজ্জাজনক অতীত অস্তিত্বকে স্বীকার করা। তা আবার করা যায় নাকি? অতএব, অস্বীকার করো, মিশিয়ে দাও ধুলোয়।

আমি যে সময়ে আর যে পরিবারে বড় হয়েছি সেখানে আমি কোনও এসি রেস্টুর‍্যান্টে ঢুকছি-- মানে কোনও এক দুর্ভাগা প্রাইভেট শিক্ষক সেই মাসে তাঁর মাইনে পাননি। আর সেটা যেহেতু খুব ঘনঘন করা সম্ভব হত না, তাই কফি হাউস ছিল আমার অনেক কিছুর আস্তানা। আমাদের সময়ের যাদবপুর কফি হাউস বুঝতে গেলে বুঝতে হবে অঞ্জনদার দাস কেবিন গানটাও। যেখানে একটু বড় অর্ডার করলে নিজেকে খাঞ্জাখা মনে হত, বসার সময়ের আওতা বেড়ে যেত বুকের রিফুজি কলোনিতে।

গেলে এই দুপুর মনে পড়ে। বা এই দুপুরগুলো মনে পড়ে।

আসলে কি জানেন তো, এই যে মেঘে ঢাকার রেফারেন্স দিলাম, সেখানে যিনি সুপ্রিয়া দেবীর বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি তো আমার প্রিয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, তিনি বলেছিলেন জঞ্জাল খুব মজার জিনিস, যা এক সময়ে আপনার শীতের রাতে জ্বালানী ছিল তা-ই মাথার উপর ছাদ এসে যাওয়ার পর জঞ্জাল মনে হতে পারে। পরবর্তীতে এই কফি হাউস আমাকে অনেক কিছুতে উদ্ধার করেছে। ছাড়বার আগে চিকেন আফগানি সব প্রেমিকাকে খাইয়েছি। ছাড়বেই যখন হেগে ছাড়ুক। সরি, আপনারা আজকাল খুব সিরিয়াস, তাই বলে দিই-- এটা ইয়ার্কি ছিল। এখানেই শুরু হয়েছিল, আমার সাহিত্য অভিসার। আমাদের তো ইউটিউব ছিল না, ত্রৈমাসিক ছিল। আর আমি এত ধারাবাহিক লেখক ছিলাম যে যার জন্যই লিখেছি সে আর দ্বিতীয় সংখ্যা বের করে উঠতে পারেনি। আপনাদের হাসি পেতেই পারে, কিন্তু সেই সময়ে কৃত্তিবাসের উল্টোদিকে আমরা বেদব্যাস হব ভেবেছিলাম।

কফি হাউস আমাকে অনেক কিছুতে উদ্ধার করেছে। ছাড়বার আগে চিকেন আফগানি সব প্রেমিকাকে খাইয়েছি। ছাড়বেই যখন হেগে ছাড়ুক। সরি, আপনারা আজকাল খুব সিরিয়াস, তাই বলে দিই-- এটা ইয়ার্কি ছিল। এখানেই শুরু হয়েছিল, আমার সাহিত্য অভিসার।

আমার নিজের স্কুল নাকতলাতে সায়েন্সের প্রথম লিস্টে আমার নাম ওঠেনি, কিন্তু দাদা জয়েন্ট, তাই আমি নিশ্চয়ই রামানুজম, এই বিশ্বাসে আমি সায়েন্স নিয়ে যাদবপুরের একটা স্কুলে ঝুলে গেলাম। সেখানে, টিফিনের পর বেরোনো যেত। আমিও জানতাম, নাকতলায় আমি যাবই, তাই বেরিয়ে যেতাম। এটা ক্লাস ইলেভেনের কথা, এই সময়ই আমার দুই প্রিয় বন্ধু কলেজ জয়েন করেছে শুধুমাত্র তারা উড়বে বলে। ওরা দুপুরে জমায়েত হত যাদবপুরের কফি হাউসে। আমি ভেবেছিলাম দারুণ আনন্দ হবে, হয়নি। উল্টে ওদের যে কোনো নারীকে আসন্ন প্রসবা করে দেওয়ার চুটকিতে গুটিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। কফির কাপে এবং আশেপাশে যে গুটখার পিকের দোল খেলা হচ্ছিল তাতে নিঃশ্বাস আটকে আসছিল। দুদিন চেষ্টা করেছিলাম, তারপর তিনটে সাইকেল আর একসঙ্গে ফেরেনি। এই যে বন্ধুরা বদলে যায়, তা প্রথমবার টের পাইয়েছিল যাদবপুর কফি হাউস, সেটাই বা ভুলি কি করে? প্রত্যেকবার বন্ধু দূরে

আমার জীবনের যে কোনও সময়ে আমি যাঁর কাছে উত্তর চেয়েছি তিনি শিব্রাম। তাঁর মুক্তারামের মেসে তিনি বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক ও লেখক সাগরময় ঘোষকেও গুঁড়ো দুধ অফার করেছেন রাবড়ি নেই বলে। অথবা বলেছেন, পরের দিন লেখেন, কারণ আজ উনি ক্লান্ত থাকেন। এখানে সুনীল, শক্তি দেখা করতে আসেন ওই খ্যাপা পাগলটার সঙ্গে। উনি স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে টাকা নেননি বা তাম্র ফলক। কারণ চাঁচোলের জমিদারের ছেলে লিখেছেন, তিনি ভুল করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হাত তুলেছিলেন। তো তার মেসটাও আর থাকছে না। পরির কলসি থেকে জল পড়বে, দারুণ কমপ্লেক্স হবে।

উপসংহার

গাড়ি পার্ক আমার সহকর্মী বাবলুই করেন। আমি সেদিন ঘটনাচক্রে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমার প্রথম বান্ধবীর বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, খুব কান্না পেল।

তুলিকলা: **শম্পা**

Best compliments from

Ethnic Weaves and Drapes

ওঁ ভগবতী ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নী চ কামদে।
কৌশিকি ত্বং মহেশানি কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
যিনি স্বয়ং ভগবতী, যিনি আমাদের সকলের মনের ভয় দূর করেন, যিনি কাত্যায়নী, যিনি মনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই ইন্দ্রাণী পরমেশ্বরী কালিকাকে প্রণাম করি।

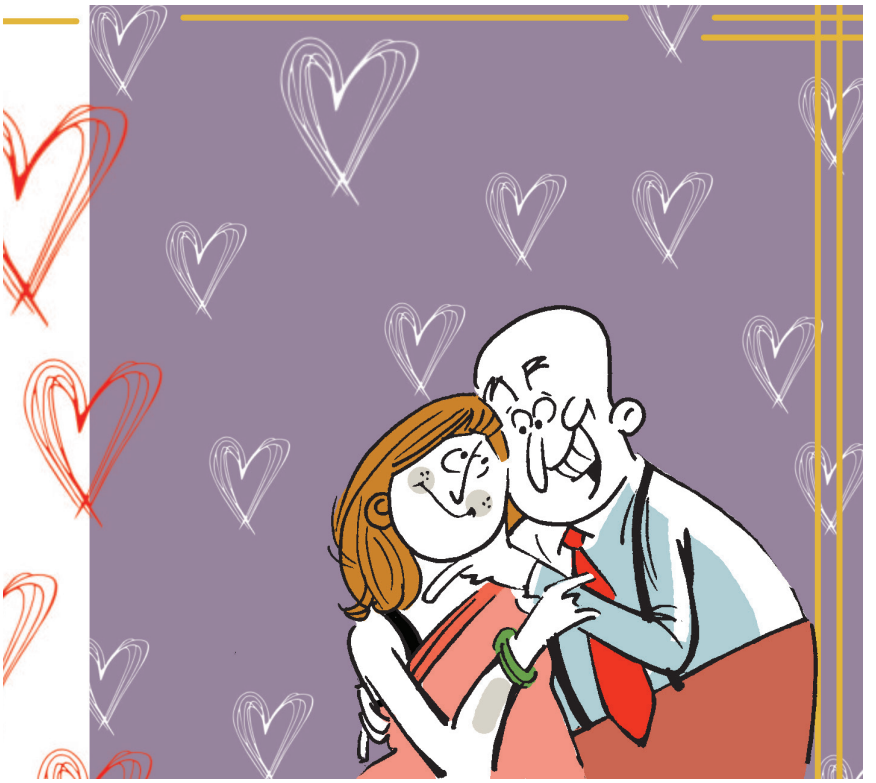

সেকেন্ড ক্রাইসিস

সুমন সরকার

একদিন লোকাল ট্রেনে চেপে কোথাও একটা যাচ্ছিলাম। আমার পাশে বাড়ির পুরোনো বাসনের মতন তালতুবড়ে যাওয়া একটা টেকো বুড়ো এসে বসল। বসেই আমাকে চাপ দিয়ে ঠেলে নিজের দিকে বেশি জায়গা দখলের চেষ্টা শুরু করল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, বুড়োর রস কম নয়। দুদিন পর ঘাটে যাবে এখনো ট্রেনে কোয়াটার পাছা জায়গার জন্য কোটার স্টুডেন্টদের মতন কম্পিটিশন করছে! লোকাল ট্রেনের সিটে জায়গার হিসেব মিটার, সেন্টিমিটার দিয়ে হয় না। এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পাছার হিসেবে হয়। একটা গোটা সিট সাড়ে তিন পাছার সমান। তিনজন ভালোভাবে বসবে আর একজন হাফ ঝুলবে। এই সাড়ে তিন পাছা মাপযুক্ত সিটের কোয়াটার পাছা জায়গার জন্য আমার পাশের বুড়োটা আমাকে ঠেলছে। অবশ্য সে নিজের জন্য ঠেলছে এই কথা সত্য নয়। বুড়োভামের সঙ্গে আছে এক ভামিনী! সে অবশ্য বুড়োর মতন সাদাকালো যুগের নয়, ইস্টম্যান কালার বলা চলে। বুড়ো তার সঙ্গিনীর কাঁধে হাত দিয়ে রেলা নিয়ে বসেছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলছে — কিগো বিরিয়ানি খাবে? কানের এতটাই কাছে যে চুমু হওয়া আর না হওয়ার মধ্যে কোনও দৃশ্যমান পার্থক্য নেই! এই যে বুড়োর টগবগ করে ফুটন্ত রস, এর নেপথ্যে কারণ একটাই। পরকীয়া! বহুদিন আগে লকআউট হয়ে যাওয়া কারখানায় আবার হরমোনের উৎপাদন শুরু। আর হবে নাই বা কেন! হয়তো, বাড়িতে পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো গিন্নি উঠতে বসতে খিস্তি করে, ঠেস মেরে কথা বলে, কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সেখানে হয়তো এই নতুন সম্পর্কে বুড়োর নতুন ডাকনাম হয়েছে শাহরুখ খান! আমার এক বন্ধু বলেছিল, ওদের ইউনিভার্সিটিতে এক প্রফেসরের কাছে অসামান্য পিএইচডি থিসিস এসেছিল রিভিউ-এর জন্য। থিসিসের বিষয় ছিল, টেকো পুরুষরা অ-টেকো পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি পরকীয়া করে।

পরকীয়া যে ভীষণভাবে বেড়েছে এটা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ইন্টারনেট খুলে দেখুন। পরকীয়া চেনার সাতটি উপায়, পরকীয়া থেকে বাঁচার পাঁচটি উপায়, পুরুষদের কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন পরকীয়ায় জড়িত,

জন্ম চন্দননগরে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবাহিত, পিএইচডি। পেশা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ট্যাটিসটিক্স পড়ানো। বড়ি আর কেলে কোট পরা টিটি ছাড়া সবই পছন্দ। ফেসবুকে অজস্র ভাইরাল পোস্ট, একাধিক বই, প্রথম সারির দৈনিকে বহু লেখা প্রকাশিত। লেখকের মতে, 'ইত্যাদি ইত্যাদি সিভিতে থাকলেও কেউই লেখক হিসেবে মানেন না।' এমনকি, বাঙালির অবনমনের আসল কারণ কি গ্যাস? — এই শীর্ষক আলোচনাতেও কেউ তাঁকে ডাকেন না। তাই লেখক নয়, এটা তাঁর 'জাস্ট পরিচিতি'।

Best compliments from
Pakrashi Harmonium

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।।

কী ধরনের মহিলারা পরকীয়া করেন, পরকীয়া ধরে ফেললে কী করবেন, পরকীয়া ধরে ফেললে কী কী করবেন না, স্বামীর পরকীয়া ধরে ফেললে বাড়িতে কী কী রান্না করবেন, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন টকদই আর ছাগলের নাদি মিশিয়ে খেলে পরকীয়া বন্ধ হতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র জ্ঞান খুঁজে পাবেন। সিনেমা, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ, উপন্যাস, গল্প, আজকাল সবকিছুতে পরকীয়ার ছড়াছড়ি। একটা কথা বলে রাখি। পরকীয়া ভালো না খারাপ, কোন পরিস্থিতিতে মানুষ পরকীয়ায় আকৃষ্ট হয়, কেউ ইচ্ছে করে পরকীয়া করে নাকি পরিস্থিতি বাধ্য করে, এসব আলোচনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বা উৎসাহ নেই আমার। আমি তিন বছর হল বিবাহিত এবং বিবাহটি আপাতত টিকে আছে। তাই পরকীয়াকে সমর্থন করে কোনও লেখা নামালে আমার গিন্নি সেই যে আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে আমার জন্য একবার চিকেন পকোড়া বানিয়েছিলেন সেটি আর বানাবেন না। আমার আবার বাইরের খাবার সহ্য হয় না।

তবে একথা একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয় যে যারা পরকীয়া করেন তাঁরা প্রভূত চাপ নেবার ক্ষমতা

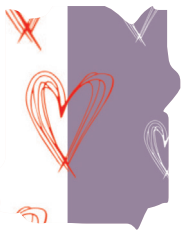

ইউনিভার্সিটিতে এক প্রফেসরের কাছে অসামান্য পিএইচডি থিসিস এসেছিল রিভিউ–এর জন্য। থিসিসের বিষয় ছিল, টেকো পুরুষরা অ–টেকো পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি পরকীয়া করে।

রাখেন। কারণ, পরকীয়া চর্মরোগের মতন গোপন ব্যাপার। এই গোপনীয়তা রক্ষা করতে প্রতিদিন তীব্র চাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। সিনেমার মতন তো আপনি ধরা পড়ে গেলে বলে দিতে পারবেন না যে ওটা আমি নয়, আমার যমজ ভাই, ডাবল রোল। ছাত্রজীবনে আমি পেশায় ব্যাংক কর্মী এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম। তার তিনটে বিয়ে! একটা সামাজিক আর দুটি অসামাজিক। লোক বলা উচিত নয়, বুড়ো বলা উচিত। গুলতাপ্পি দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন সংসারে থাকত। একটা ব্যাংক জালিয়াতির সময় ধরা পড়েন। তখন দেখা যায় প্রতি মাসের মাইনে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি সংসারে সুন্দর ঢুকে যায়। চতুর্থ বিয়ের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় টাকা কম পড়ছিল। তাই ব্যাংকে কিছু এদিক–ওদিক করেছিলেন। সেই বুড়ো লোকটির টাক ছিল! আমার ছাত্রজীবনে এক বন্ধুর কাছে আর একটি পরকীয়ার গপ্পো শুনেছিলাম। বন্ধুটি যে ইনস্টিটিউটে পড়ত সেখানে এক বেশ উঁচু পোস্টের অফিসার তার চেয়ে নিচু পোস্টে চাকরি করা এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়া করতেন। মহিলা অফিসঘর পাল্টে সেই অফিসারের চেম্বারেই বসতেন এবং দরজা ভেতর থেকে সবসময় লক করা থাকত। কেউ দেখা করতে এলে বলা হত, বড়সাহেব জরুরি ফাইল দেখছেন। অফিস শেষে সেই অফিসার এবং মহিলা একই সঙ্গে বাড়ি ফিরতেন। মহিলা একটু লজ্জা লজ্জা মুখে হাঁটতেন। অফিসার ভদ্রলোক দেমাগ নিয়ে পা ফেলতেন। সেই অফিসার লোকটির মাথাতেও টাক ছিল। টাকবাবুকে দেখলে মনেই হবে না তিনি পরকীয়া করতে পারেন! একটা বিয়ের পর আবার একটা সম্পর্কে! অসম্ভব। তাঁকে দেখলে মনে হবে তাঁর জন্ম হয়েছে ফাইলে সই করার জন্য। আসলে পরকীয়ার মজা এটাই। থোবড়া দেখে বোঝার উপায় নেই! আমি স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে পড়াশুনা করেছি। আমার এক বন্ধু আক্ষেপ করে বলত — 'বুঝলি ভাই এসব স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে লাইফ ঝাড় হয়ে গেল। বিয়ের আগেও কেউ জুটল না আর বিয়ের পরেও কেউ জুটবে না। আর্টস নিয়ে পড়লে ভালো হত। ওদের কলেজে প্রেমিকার অভাব ছিল না, এমনকি বিয়ের পরও প্রেমিকার অভাব নেই। ডেটা বলছে, বাংলা অনার্স পরকীয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে। আর আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স তো মেধাতালিকাতেই আসতে পারেনি।' আমি বুঝলাম, বন্ধুটি খুবই হতাশ। তাকে বোঝালাম, প্রেম, বিয়ে এইসব অভিজ্ঞতা জীবনে একবার হওয়াই ভালো। লাইফে এমনিতেই এত চাপ। তারপর আবার কে পরকীয়ার চাপ নেয় ভাই! ছোটবেলায় পড়েছিলাম — পরকীয়া মহাক্রিয়া যদি না পড়ো ধরা! আর ধরা আপনি পড়বেনই! মোসাদ র এজেন্টরা ধরা পড়ছে আর আপনি তো পাতি শ্যামলদা! চায়না পাল ফেসবুকে — 'এসো শ্যামল সুন্দর' গান গেয়ে আপলোড করলেন। শ্যামলদা লাইক দিলেন। দুজনেই ভাবছেন কেউ বুঝল না যে চায়না পাল আসলে ঘুঁটেমুখো শ্যামলদাকেই সুন্দর বলার জন্য গানটি গেয়েছে! কিন্তু, শ্যামলদার গিন্নির রাডারে সবই ধরা পড়ছে। দুর্গন্ধ, অজ্ঞতা, পায়খানা, পরকীয়া এগুলো কোনটাই চেপে রাখা যায় না। পরকীয়া বলতেই একটা ক্রাইম থিলার টাইপ ফিলিং হয়। কারণ, একজন চায় পরকীয়া লুকিয়ে রাখতে আর একজন চায় পরকীয়া হাতেনাতে ধরতে। প্রাইভেট ডিটেক্টিভের দরকার নেই। যে বোঝার সে ঠিকই বুঝে নেবে।

এই লেখা পড়ে অনেকেই ভাবছেন আমি হয়তো আমার স্ত্রীর ভয়ে পরকীয়া বিরোধী কথা লিখেছি। অথবা ধূমকেতুর মতন আড়াই হাজার বছরে একবার যে চিকেন পকোড়ার দর্শন আমি পাই তার জন্য হয়তো এসব লিখলাম। যা ভাবার ভাবতে পারেন। কিন্তু, আমার যুক্তি খুব সিম্পল। সম্পর্ক মানেই ক্রাইসিস। একটা ক্রাইসিসের মধ্যে থেকে আর একটা ক্রাইসিসে জড়ানো গাধামি ছাড়া কিস্‌সু না।

তুলিকলা: **শম্পা**

Best compliments from

Heena Joshi

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।
ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

Best compliments from

Janet Z. Wan

ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রণতোহস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥
যিনি দেবাদিদেব মহাদেবের বিভূতি স্বরূপিণী, ঈশ্বরী, মহাদেবের পত্নী, যিনি সংসার সাগর থেকে আমাদেরকে দয়া করে উত্তীর্ণ করেন সেই দেবী দুর্গাকে সর্বদা প্রণাম করি।

পুজোর গান

অমিতাভ বসু

দশ দিশি আলো করে, এলি মা মোর আঁধার ঘরে।
শূন্য যে মোর ফুলের সাজি, ফলের আশা নেইকো আজি,
চোখের জলের অভিষেকেই নেবো তোরে বরণ করে।
সোনাদানা নেই তো ঘরে, ভক্তি শুধু হৃদয় ভরে —
বরণ ডালি সাজিয়ে তাতেএবার মাগো পূজি তোরে।

মন্ত্র কিছুই নাহি জানি, গুরুর শরণ নাহি মানি —
কান পেতে রই আপন মনেই, অভয়বাণী পাবো জানি।
শত অভাব ভুলিয়ে মাগো, শূন্য ঘরেই তুমি জাগো —
সকল ভুলে হাসিমুখে, তারেই পরম ভাগ্য মানি॥

ওয়ালনাট ক্রীক, ক্যালিফোর্ণিয়া

মরেই গেছি

অরুণাশিস সোম

তোমায় কেবল চেয়েই গেছি,
আগুন দেখে ধেয়েই গেছি,
প্রেমের ধ্বনি গেয়েই গেছি,
কান পেতে আজ শোনো !

অলীক এমন চাওয়ার কাছে,
দুমুখো এই হাওয়ার কাছে,
তোমার ফিরে যাওয়ার কাছে,
ঋণ ছিল না কোনো !

তোমার মায়া দৃষ্টি হয়ে,
জঘন্য এক বৃষ্টি হয়ে,
দুঃখে অনাসৃষ্টি হয়ে,
নিভিয়ে দেবে আলো !

রাত—বিরেতে ছাদের ধারে,
কিংবা পাহাড় খাদের ধারে,
হৃদয় অবসাদের ধারে,
মৃত্যুতে জমকালো !

ইচ্ছে করে দূরেই গিয়ে,
এক লহমায় উড়েই গিয়ে,
প্রেমের আস্তাকুঁড়েই গিয়ে,
একলা বসে থাকি !

তখন কে আর চমক দেবে?
কথায় কথায় ধমক দেবে?
উৎসবে জাঁকজমক দেবে?
গল্প তবু বাকি !

তোমায় যেদিন ছাড়িয়ে যাব,
সকল ব্যথা সারিয়ে যাব,
অনেক দূরে হারিয়ে যাব,
খুঁজেই পাবে না তো !

হয়ত সেদিন মরেই গেছি,
তোমার থেকে সরেই গেছি,
বৃথা এত লড়েই গেছি,
চোখের জলে স্নাত !

হব্যবাহ

তুফানের প্রকোপ বাড়ে, তবে কে বাঁধবে সুতো?
তোমার ওই হৃদয় দেরাজ, আমি রই অনাহুত !

আগমন আগুন জ্বালায়, প্রস্থানে দাহ্য ধোঁয়া,
ঘড়িদের সময়ধরা, ঘুড়িদের আকাশছোঁয়া !

বুকে যে দেয় হাতুড়ি, সেই ফের কাস্তে ধরে,
ক্ষত তাও রয় নীরবে, বুদবুদে তারস্বরে !

কাছ থেকে দু—চার কথা, না ছুঁয়ে ফেরৎ আসা,
যে গড়ে ক্ষীরের পুতুল, সেই বাঁধে বাবুই—বাসা !

কথাতে এড়িয়ে গেলে, ঘুমে তাও স্বপ্ন দিও,
প্রেমে যে স্বভাবদোষী, ফ্রেমে সেই কাকতালীয় !
পাহাড়ের শেষ সীমানায়, নৈঋতে দাঁড়াই এসে,
তুমি ঠিক স্পষ্ট হলে, ঝাপসার ছদ্মবেশে !

আঘাতের হব্যবাহে, উদাসীন ব্যথার আতর,
আমি নই পাথরবাটি, তুমি নও পরশপাথর !

আমার কন্যা আমার দুর্গা

জয়া চৌধুরী

সুদূরে যেখানে ঝরে পড়ে আছে লাল ম্যাপেলের পাতা সেখানে মেয়েটা রোজ শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, উদ্দেশ্য লক্ষ্যে পৌঁছানো। দৃঢ় দীপ্ত পদক্ষেপ তার , যেন বলে ওঠে — আমিই সেই নারী, আমিই সেই দূর্গা।

শীত যায় বসন্ত আসে শরতের উৎসবে পাতারা রঙ্গীন হয়। রঙ্গীন আলোয় মেয়েটার মুখ আলোকিত হয়ে ওঠে। উৎসব আমেজে তিরতির করে নৃত্য ছন্দে নেচে ওঠে তার পা দুটো।

ও যে ভালোবাসে আনন্দ , তাই সবার সাথে হাত মিলিয়ে গড়ে তোলে আনন্দ নাড়ু— ব্যস্ত হয় পূজোর কাজে
সিঁদুরে কুঙ্কুমে বরণ করে মাকে।

দশভূজা দুর্গা হয়ে ঘরকন্না,দশদিক সামলে আবার অন্যায়ের প্রতিবাদে ত্রিনয়ন থেকে জ্বলে ওঠে বহ্নিশিখা । দুঃখ কষ্ট ভয় সব জয় করে সবাইকে আপন করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে আমার কন্যারা।

দূর প্রবাসে আমার সমস্ত কন্যাদের জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা আর আদর।

ভালো থেকো সব দুর্গা আমার
শহরে গ্রামে ও প্রবাসে
নতুন সময়, দিগন্ত নতুন
প্রতিবাদে ওঠ জ্বলে,
জ্বলে ওঠ তেজে,
দ্বার———
আমার দুর্গারা আলো জ্বেলে দাও
ঘুচুক অন্ধকার॥

এঁকে দাও সৃষ্টির ইতিহাসে ।

খোলো শত বছরের রুদ্ধ বন্ধ

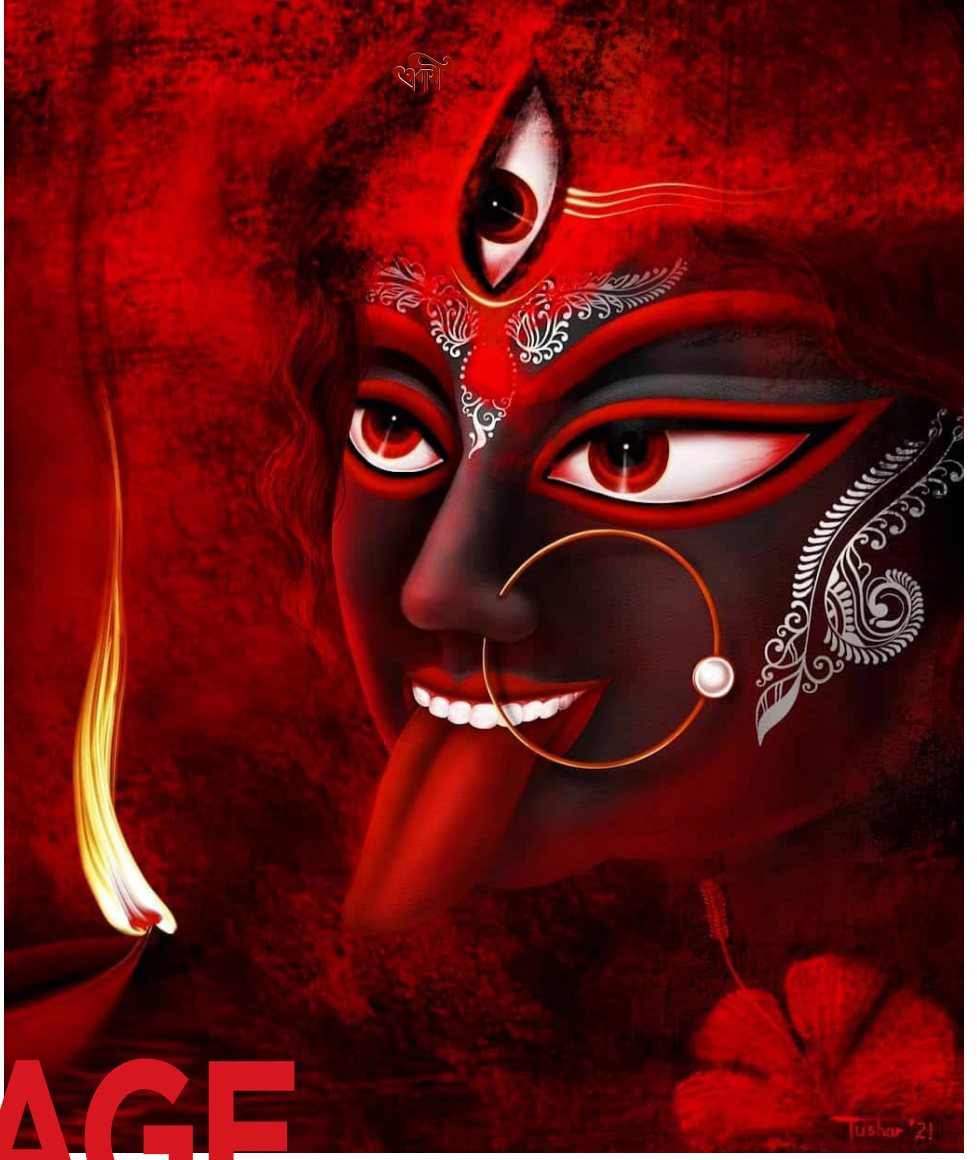

IMAGE OF KALI

By Partha Sarkar

We are all familiar with the goddess Kali's image: the dark complexion, disheveled hair, tongue sticking out and a garland of human skulls on her is ominous indeed, hardly befitting a goddess. And then there is her husband lying under her feet (is it a precursor to present day female 'overemancipation'?). We are so used to the image that we rarely question its origin or significance. From our experience we would expect the origin to lie in the hoary past (5000 or 10000 years old, depending on how 'Hindu' you are). There is surely aVedic Sukta

vermillion spread over her forehead while she was wiping the sweat from her forehead. The hair was untidy. When she came face to face with an elderly Krishnananda, she bit her tongue in shame. This posture of the housemaid was later utilized to envisage the idol of Goddess Kali. Thus was formed the image of Kali.

Sometime in the mid to late 16th century, KrishnanandaAgamavagisa, a Bengali mystic (born after 1500) had an apocryphal powerful experience which resulted in a "new" form of Kali. It is said that Krishnananda went to bathe in a river near a cremation-ground (either at Tarapith or Bakreshwar, both in West Bengal), where he happened to stumble upon a dark-skinned tribal – probably Santhal -- girl who, believing she was alone, had stripped naked and was washing herself using a discarded skull-cap

somewhere hidden in the huge corpus, which may be construed to describe our present goddess. And there would be no dearth profound explanations of deep philosophical significance regarding the various aspects of the image (e.g. the extremely dark skin).

However, to our disappointment, the origin of the image is probably more prosaic and only dates back to around the sixteenth century. It appears that a well-known Tantric went to the river bank before daybreak as part of his daily ritual. There he encountered a dark skinned woman also taking her bath. The woman was scantily dressed, thus quite taken aback. She stuck her tongue out in shame. The Tantric got visions of Kali in the woman giving rise to the present day image. I have collected a few samplesthrough the Google (where else?)which I present below. They all essentially tell the same story.

Initially the Goddess Kali was worshiped without any image. People used to pray

goddess Kali in a small pot (Ghot)-under a tree. At around 1450 KrishnanandaMoitra who was honored with the Title AGAMBAGIS, first felt to worship the goddess Kali with a proper IMAGE. One day in a deep meditation, Krishnananda invoked goddess kali and sought an image of the goddess. When his sadhana reached 'Turiya' state (the highest stage of Kulakundolini) he was instructed that the first lady, whom he would see on the very next day morning, would be the hint of the image. Being too exited he could not sleep and in the wee hour, he started his search. On his way he saw a low caste black lady who was at that time busy in her domestic works. Her sari was displaced, vermillion mark was distorted, and both of her hands were full of cow dung. Her right leg was uplifted while she was working. Being too excited Krishnananda shouted – 'Joy Maa'. As soon as the lady heard this and saw krishnananda, she became ashamed and her tongue came out. Krishnananda captured this in her mind and had drawn the image of Kali. This image is popularly known as Agomeswari Kali or Dakshina Kali. Later many worshipers had drawn various images of Kali as per their own imagination and interpretation – but the basic image remains same. Agomeswari Kali with all the basic form is still worshipped in Nabadweep, Nadia (Agomeswari Para).

More information on this can be found in the book 'Mythology of the Hindoos',writtenbyReverend William Ward and in various books published by UdbodhanKaryalaya (Ramakrishna Mission Publication).

The detailed description of the image of Goddess Kali can be found in Krishnananda's book- 'BrihatTantrasar' (The best book of Tantra Sadhana till date).

It is believed that the present form of Kali is due to a dream by a distinguished scholar of Indian charms and black magic or 'Tantra' and the author of Tantric Saar, KrishnanandaAgambagish, a contemporary of Lord Chaitanya. In his dream he was ordered to make herimage after the first figure he saw in the morning. At dawn, Krishnananda saw a dark complexioned maid with left hand protruding and making cow dung cakes with her right hand. Her body was glowing with white dots. The

from a nearby funeral pyre. Her long black hair untied, and she was engrossed in her bathing, when some movement made her aware of the watchingKrishnananda. Embarrassed the sudden gentleman intruder, she stuck out her tongue in shyness (a reflex action still done by village girls in India). Krishnananda, who had been trying to understand how best to comprehend the many varied forms of divinity, had a sudden and powerful mystical experience, he felt that the skies had opened and he had obtained a direct vision of the primordial female principle. He viewed this tribal girl as a living Kali, and took the "vision" of her naked dark body, long disheveled hair, extended tongue and skull in hand as a new and especially potent icon. The tribal girl symbolizes the hitherto marginalized animism in this story. For the rest of his life, Krishnananda evangelized this special form of Kali far and wide. Around 1580, he wrote theTantrasara, an 'Essence of Tantras', in which he gave the following description of the Dark Goddess and which forms the basis of the typical Bengali Kali icon:

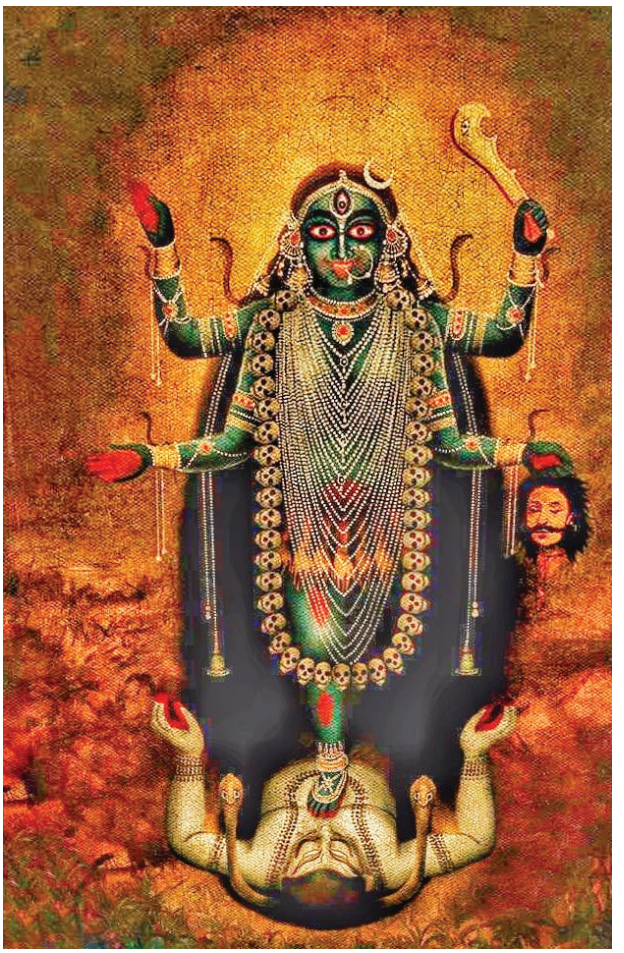

In this context, I cannot help bringing up an event described in Sunil Gangopadhyay's novel 'Prothom Alo' (First Light), a period piece encompassing the times of Rabindranath, Vivekananda, J.C. Bose etc. In it he relates an incident where Sister Nivedita was delivering a lecture of Goddess Kali in Albert Hall. She was speaking eloquently to an audience, which included many eminent persons of the time. SuddenlyDr. Mahendralal Sircar (no relation of mine!)stood up and started vociferously heckling the speaker, accusing her, a newcomer to India and Hinduism, of spreading rabid superstitions and pushing back to further darkness. Sister Nivedita tried to explain her position calmly, at which the doctor shot back thunderously: The whole theory of the pujas is mere hypocricy, deceit. A few Tantrics to whet their sexual appetites have molded an image of a 'langta magi'(nude woman) and their worship is accompanied by sexual excesses and excessive drinking and meat eating. The raucous continued with the whole audience involved, till Dr. Sircar left the audience realizing he had very little support. A lot of readers took offence at this description in the novel, to which Sunil Ganguly duly responded alluding to the historical basis of the Kali image.

Now, Dr. Mahendralal Sircar was a very distinguished man. He was one of the earliest MDs from Calcutta Medical College, but shifted over to Homeopathy since he felt that way he could better serve the poorer sections of the community. Dr. Sircar treated Ramakrishna Paramahamsa during his last illness. He was in total awe of the saint but his rational mind prevented him from accepting Ramakrishna as an Avatar. And finally, Dr. Sircar may arguably be hailed as the Father of Indian Science. He, almost singlehandedly, with some help from Father Lafont of St. Xavier's College (a mentor of J.C. Bose) established The Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), the first institution of scientific research in India. IACS is where the Nobel Laureate C. V. Raman did a major part of his early research is still a very active in scientific research.

Best compliments from

Sam Naha

রূপান্তরিত

অনুপ দাশ , ১২

এয়ারপোর্ট থেকে ক্যাব নিয়ে চলেছি বাবার আর আমার কলকাতার পৈতৃক বাড়ির দিকে। দূর্গা পুজোর সাজো সাজো রব শহর জুড়ে। মনটা যেন কলকাতার ভোরের বাতাসে ফুরফুরে হয়ে উঠল। এবার দেখলাম শহরের চেহারা অনেকটাই বদলে গেছে, সকালে জ্যাম জট বেশ কম। ট্র্যাফিক সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ানোয় উগ্র সাজের এক মহিলা কাঁচের জানলায় হাতে তালি দিয়ে টাকা চাইছিলেন, সাথে সাথে আমাদের ড্রাইভার বলে উঠল একদম কাঁচ নামাবেন না স্যার, আমরা তার কথা মত কাঁচ নামালাম না। কিন্তু মনের ভিতর কেমন একটা খারাপ লাগা অনুভব করলাম।

পঞ্চমী, ইতিমধ্যে রাস্তায় মানুষের ঢল্ নেমেছে বিশেষ করে অল্পবয়সী দের মধ্যে উত্তজনা তুঙ্গে।আজ আর বেরবো না ঠিক করলাম, জমিয়ে রেস্ট নিয়ে কাল থেকে শুরু করব প্যান্ডেল হপ্পিং। বাবার মূল উদ্দেশ্য কলকাতার থিম পুজো গুলোর ছবি তুলে একটা ডকুমেন্টারি বানানো। ইউনেস্ক থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পাওয়ার এখন আমেরিকা বাসীরাও এই পুজো নিষে বেশ কৌতূহলী।

ষষ্ঠীর দিন দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন পুজোয় ঘুরে ছবি তুললাম , সকলেই কোন থিমের উপর পুজ করেছে, আতিশয্য আর বৈভবে চোখ ধাঁদিয়ে গেলেও পুজোতে আন্তরিকতার অভাব অনুভব করলাম।

সপ্তমীতে গেলাম কুমোর পাড়ায়। এখানে মায়ের মুখ বড় মায়াময়ী। কিন্তু সব জায়গাতে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে - জেতার প্রতিযোগিতা। একটু হেঁটে যেতেই দেখি এক বাচ্ছা মেয়ে একটা ছোট্ট পুজোর দিকে যেতে চাইছে সেখান থেকে ধূপ ধুনার গন্ধে মায়ের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে , কিন্তু তার বাবা-মা কিছুতেই তাকে সেই দিকে নিয়ে গেল না। আমার কৌতূহল হলো, এগিয়ে গেলাম সেই নিষিদ্ধ পুজোর দিকে।

কোন আড়ম্বর নেই শুধুই আন্তরিকতার সাথে মায়ের আরাধনা চলছে। চারিদিকে কেবল উগ্র সাজের মহিলাদের দেখতে পেলাম। এরা সকলেই রূপান্তরিকামী সমাজের পুজোয়ে এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাই নিজেদের মত করে মায়ের পুজো করেছেন।

পুজো-পুজো গন্ধটা আমরা এখানেই পেলাম আর সিদ্ধান্ত নিলাম বাবার ডকুমেন্টারি ফিল্মের বিষয় হবে এই রূপান্তরিকামীদের পুজো।

এলা

মানস চক্রবর্ত্তী

Cherry-র ওপর I-95 নেবার ঠিক আগে Sun gas station-এ একবার থামে মনীশ। গাড়ী থেকে নামে না। ফোনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। রাত প্রায় আড়াইটে বাজে। ঘুম আসছে। সারা শরীর জুড়ে ২০০৭ Chalk Hill Cabarnet-র হালকা আবেশ। টেক্সট্ পাঠাবে কি পাঠাবে না, কিছুতেই মনস্থির করতে পারেনা মনীশ। মন চঞ্চল হয়। তোলপাড় হয়ে যায় সব চিন্তাধারা। শেষ মেষ রাতের সেই গভীরে, সব যুক্তির বিপরীতে প্রেমের আবেশে ভরা মন জিতে যায়। ফোনটা তুলে নিয়ে মনীশ লেখে — Hey, during the last leg of the party, U seemed pretty down! U ok?

বুড়ো আঙুলটা Send button-র ওপর আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করে। এলার মুখটা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। Send বাটনটায় আলতো চাপ দেয়। iPhone-এর confirmation আসে – 'Delivered'.

শীতের সেই শনিবারের রাতে, বাড়ী ফেরার পথে, I-95-এর সেই মোহময় রাস্তা দিয়ে ড্রাইভ করতে করতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় মনীশ। পেছনে ফেলে-আসা শহরের চিকমিকে আলো যেন হাজার মোমবাতির সারি।

নিভিয়ার বাড়ির সন্ধ্যেটা অসাধারণ ছিল। মনীশ মনে মনে সাজায় সন্ধ্যেটা। ও যখন পৌঁচেছিল ততক্ষণে চেঁচামেচি হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে গেছে। কিচেনের আইল্যান্ডে ধরে ধরে অ্যাপিটাইজার সাজানো। ড্রিংক্স্ কেবিনেটের সামনে ছেলেদের আড্ডায় ক্রিকেটের তুমুল আলোচনা। জার্সি-ক্রিকেটের খেলায় মাত্র এক রাণে আউট হয়ে গেছে — এই নিয়ে সবাই ওর পেছনে লাগছে। মেয়েদের আড্ডায় মিঠুর গলা শোনা যায়, 'এ্যাই সবাই শোন না মন দিয়ে। নিউ ইয়ার্স ইভের ফাইনাল প্ল্যানটা বলছি।'

মনীশকে ঢুকতে দেখে নিভিয়া এগিয়ে এসেছিল, 'এসেছ ফাইনালি, এত দেরী কেন? মনীশ ড্রিংক্স্ ক্যাবিনেটের দিকে এগোতে এগোতে বলে, 'একটু দেরী হয়ে গেল বৌদি, অফিস গিয়েছিলাম একবার।

অফিস না ছাই! দেখ, হয়ত কোন টপলেস্ বার-এ গিয়ে মজা করে এলে — সিংগল ছেলেদের নিয়ে এই বিপদ,' নিভিয়া কপট বকুনি দেয়।

অর্ণব এগিয়ে এসেছিল, 'আরে তুই এসেছিস, নে ড্রিংক্স নিয়ে এখানে আয়।'

মনীশ ড্রিংক্স্ ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যমনস্ক ভংগীতে সামনে রাখা চকহিল ক্যাবারনে অথবা ২০০৯ অ্যাকিনোস্ পিনো নোয়া নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। খেয়ালীর সংগে ভালবাসা, বিয়ে, ডিভোর্স - সবকিছু চোকের সামনে ভেসে যায়। কিন্তু সেসব এখন ভাঙা অতীত। কোনদিনও ভাবেনি এমনভাবে কাউকে আর কোনদিনও ভালবাসতে পারবে। কৈনদিনও ভাবেনি দ্বীপের বউ এলা ওর সবকিছু এমনভাবে ওলট পালট করে দেবে। ঝানে এই নিস্তব্ধ নীরব ভালবাসার কোন পরিণতি নেই, জানে এই সম্পর্কের কোন নাম নেই — তবু এই মন মানে না — ছোট পাহাড়ী রাস্তায় বেলফুলের ঝাড়ে, সমুদ্রের ঢেউয়ে, ওর হাত ধরে শুধু পথ হাঁটতে চায় মনীশ। হঠাৎ চমক ভাঙে। ঐকটা গ্লাস চক-হিল নেয়। 'এই মনীশ, কীরকম বন্ধু তুমি? একদিনও ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যাও না! ওয়াইন গ্লাস পরিতৃপ্তির একটা চুমুক দিয়ে সছল ভংগীতে সে বলে উঠেছিল — সে তো এলা ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

মনীশের শরীর নিথড় হয়ে গিয়েছিল। মন কেঁদে উঠেছিল। চোখ তুলে এলার দিকে তাকিয়ে ছিল মনীশ। কিচেন আইলেন্ডে হেলান দিয়ে এলা দাঁড়িয়ে। এলোমেলো খোঁপা, দুরন্ত চোখ, কাঁটা ভুরু, শিথিল ঠোঁট, শিফন শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে পাথরে খোদাই করা ওর বুক, ঝিনুকের মত নাভি, ওর সারা মুখ জুড়ে সোনা রোদ্দুরের দীপ্তি — কোথাও উদ্ধত, কোথাও নম্র - মনীশের মনে হয় মোনে'র অনাবিল সৃষ্টি — Lady with a Parasol-এর মূর্তি। শুধু একটা ছোটট ছাতা যদি ওর হাতে থাকত — পৃথিবীর কোন রোদ্দুর, কোন বৃষ্টি ওকে ছুঁয়ে যেতো না।

'যাব একদিন,' মনীশ উত্তর দিয়েছিল ধীর গলায়। দ্বীপকে বলব ডাউনটাউনে ভাল একটা ইটালিয়ান রেস্টুরাণ্ট খুঁজতে।'

'ধ্যাৎ, দ্বীপকে নিয়ে কে যাবে।' এলা চোখ পাকিয়ে বলেছিল। দ্বীপ যখন ট্র্যাভেল করবে তখন যাব পাগল — তুমি আর আমি। ধাঁড়াও, পারমিশনটা নিয়ে রাখি।' দুড়মুড়িয়ে ছেলেদের ভীর থেকে দ্বীপকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছিল এলা। মনীশের সামনে দাঁড় করিয়ে, কপালের চুল কানের পাশে গুঁজে দিতে দিতে বলেছিল — 'নাও, এবার বল।'

'তোর বউ আমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে বলছে। থুই যখন ট্র্যাভেল করবি,' মনীশ হেসে বলেছিল।

দ্বীপের মুখে হাসি, চোখে সুগন্ধী বিশ্বাসের ছাপ। মনীশ মনে মনে বলে, দ্বীপ তুই প্লিজ না বলে দেয়। তোর বিশ্বাস দেখে আমার ভয় হচ্ছে। এই মেয়েটা পাগল। ও জানে না আমার দুর্বার ভালবাসার কথা। ও জানে না আমার মনে প্রাণে ও আকুল ফুলের আঠার মত জড়িয়ে....

'তা যা না নিয়ে। এলা, গো টু মনরেসা ইন ডাউনটাউন মানহাট্টান। ইট ইজ এ্যা গুড ওয়ান, ডোন্ট সেসটল্ ফর লেস্।' দ্বীপ এলার কোমর জড়িয়ে বলেছিল।

এলা দাঁড়িয়ে ছিল। চোখেমুখে দুষ্টু হাসি। মনীশ ভাবে ১৯৮৬-এর Chateau Lafite-এর মত ওর ঠোঁট পৃথিবীর সব প্রেমিকদের .....। মনীশ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

তারও পরে ছেলেদের ভিরে মনীশ যখন মাংস আর ভাত নিয়ে বসেছিল, এলা এসেছিল ওর প্লেট নিয়ে। 'এই সরো ত একটু, বসি এখানে। 'বসো,' মনীশ একটু সরে গিয়ে বলেছিল।

নিভিয়া কিচেন থেকে গলা উঁচিয়ে বলেছিল, 'এই এলা, একটু দেখিস তো। মনীশ যেন ঠিক করে খায়। ভীষণ লজ্জা পায় ও।' এলা বলে উঠেছিল, 'জানি ত, সেই জন্যই ত পাশে এসে বসলাম।' মনীশ মাংসের একটা টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল অনেকক্ষণ থেকে। মনে হয়েছিল এটা ওর Last Supper। যীশু যেমন ক্রুসিফিকশানের আগে অ্যাপোসলদের সাথে বসে শেষ খাবার খেয়েছিল, মনীশের মনে হল, সর্বনাশের গভীরে তলিয়ে যাবার আগে এটা ওর শেষ খাওয়া। আরো গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ফোনটা তুলেছিল মনীশ। না, কোন উত্তর নেই। কোন জবাব নেই এলার।

|| ২ ||

রাত পৌনে তিনটে বাজে। দ্বীপ ফিরেই বিছানায় ঘুমে কাতর। এলা ক্লজেটে দাঁড়িয়ে শাড়ি ছাড়ে। ব্লাউজ, ব্রা আর শায়া খুলে ফেলে দেয় হুকের ওপর। একটা তোয়ালে জড়িয়ে শাওয়ারের নীচে এসে দাঁড়ায়। অঝোর করে নেমে আসে ঝর্ণার জল। চন্দন সাবানে গা ধুতে ভাল লাগে এলার। শরীরে চন্দনের গন্ধ হয়ে যায়। চোখ বুজে সন্ধ্যেবেলার কথা ভাবে। কেন এমন হয় — কিছু ভাল লাগে না। দ্বীপের কাছে সব পেয়েও কেন এমন হয় মাঝে মাঝে? কেন দ্বীপ কাজে এত পাগল? কেন এত ট্র্যাভেল করে? কেন ও মনীশের মত গল্প-কবিতা লেখে না? কেন দ্বীপ শুক্রবার হঠাৎ ফোন করে বলে না, 'অ্যাই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসছি। চল আজ আমরা সিটিতে যাব ডিনারে।'

গা ধুয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে হঠাৎ ফোনের দিকে চোখ যায়। মনীশের টেক্সট। অদ্ভুত তো! কেমন করে বুঝতে পারে ও প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি মুডের হেরফের কেমন করে টের পেয়ে যায় ও! যদিও মিঠু ওকে বহুবার বলেছে, 'তুই কিছু বুঝিস না, ও তোকে ভালবাসে। কী-রে তুই?' এলা কোনদিন গা করেনি। জানতে ভয় হয়েছে ওর। ভালবাসার অনুভূতি ও জানে না, জানতে চায় না। টেক্সটটা পড়ে ঠিকই, কিন্তু উত্তর দেয় না। আস্তে আস্তে বিছানায় যায়। অঝোরে ঘুমোচ্ছে দ্বীপ। নাক ডাকছে অসম্ভব। চোখ বোজে এলা, কিন্তু ঘুম আসে না। মনীশের ই-মেইল, মনীশের লেখা কবিতা — টুকরো টুকরো চোখের সামনে ভাসে।

Sometimes I wish I hadn't done certain things in life, Ela. The deeper I get, the harder it is to extricate myself. Too many hooks, chains, cuffs and strings. Life, circumstances, decisions, situations, pitfalls….and the consequences of it all…. leave me where I am today. Life can be so haunting… a conscience can kill.

'তাই ত তোমার জন্য আমি সব দেব। এই প্রাণ, এই ভাঙা মনের ...। এই শরীরের উষ্ণ উত্তাপ, আমার বাঁশি বাজানো মুহূর্ত - আমি সব দেব। নির্জন গভীরে, বাসা বাঁধা পাখীর বুকে তুলে রাখা আমার স্বপ্ন আমার সাধ, আমি সব দেব।'

পাশ ফিরে শোয় এলা। শারা শরীর জুড়ে যন্ত্রণা। ঘুমের আবেশে মনীশের মুখ ভেসে আসে। What do I mean to you? এলা প্রশ্ন করে। কণ্ঠস্বরে সাবলীলতা, চোখে জল টলমল, অন্ধকারে এলার এক উদ্ভাসিত মূর্তি। You mean everything to me, silly – don't you know that! চোখ জুড়ে ঘুম আসার আগে এলা শোনে। শরীর কাঁপে। মনীশের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট মিলিয়ে দেবার আগের মুহূর্তে এলা বলে, I don't want to kiss you — চোখ ভালবাসায় ভরা, সারা শরীর জুড়ে কাঁপন। মনীশের হাত এলার সারা শরীর আবিষ্কারে মত্ত। মনীশের ঠোঁট এলার কানের ললিতে, ঘারে, গলায়, বুকের খাঁজে। উত্তাপ আসছে, ঝড় আসছে এলা টের পায়। শরীর সারা দেয়, মন সারা দেয়, উৎসর্গের মহা বোধন হয়। মনুর গতি দুর্বার হয়। পরম সুখের আবেশে চোখ বোজে এলা। ভীষণভাবে ভালবাসতে জানে মনীশ। প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করে এলা।

'এই', মনীশ এলার কানের কাছে মুখ এনে বলে।

'কিছু বল না — প্লীজ'। অবসানের শেষ মুহূর্তে কথা হারিয়ে যায়। ঝড় শান্ত হয়। আবেশ ভাঙে।

ফোনটা বালিশের পাশ থেকে তুলে নেয় এলা। ভোর চারটে বাজে। দূরে কোথাও একটা নাম না-জান পাখীর ডাক। Backyard-এর sprinkler-এ ঝিড়ঝিড়ে জলের শব্দ। এলা টাইপ করে, Let's spend some time together. Dinner next Tuesday?

প্রেমিকদের মন খারাপ

আলোদীপ সান্যাল

এই শহরের প্রেমিকদের আজ মন খারাপ
বর্ষার অনিয়মিত অভিসারে শহর কলকাতাও যেন ক্লান্ত
পড়ে আসা বিকেলের বারান্দায় ভ্রুকুটি দেখে
অনেক কথাই শেষমেষ অনুচ্চারিত থেকে যায়।

মেঘ সরে যাক। সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে দাও
পৃথিবীর সব প্রেমিকের হৃদয়ের আনাচে কানাচে
কৃষ্ণচূড়ায় রাঙানো এই বিকেলে
আর কি অভিমান করে থাকা চলে?

ভাবছি এবার ঘর থেকে বেরোনোই ভালো
হয়তো আর ফিরবো না
সদ্যরোপিত পলাশের চারাটিকে
নিয়মিত জল দেবার ভার দিলাম তোমায়

হাজার বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস বয়ে চলা এই শহর
এবার একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোক।

অর্ধশতবর্ষে প্রবাসী..2023
নিরঞ্জন রায়

,,,

দুহাজার বাইশে প্রবাসীর
বয়স,ছিল উনপঞ্চাশ,
দেখতে দেখতে তা হলো পঞ্চাশ।
প্রবাসীর সভ্যরা সর্বদাই ভাবে,
কি ভাবে পঞ্চাশ বছর
সুসম্পন্ন হবে।
তাই নিয়ে তোড় জোড়
শুরু হয়ে গেল,
যে যেখানে ছিল সবাই
একত্রিত হল।
সভ্যদের যদিও বাস
আলাদা সবার,
তা সত্ত্বেও তারা যেন
এক বিরাট পরিবার।
নাচ, গান, নাটক নানা
সাংস্কৃতিক আয়োজন,
বলি, টলিউডের কুশীলবের
নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

পুরোনো প্রতিষ্ঠান বলতে
সকলে প্রবাসীকেই ভাবে,
খাওয়া দাওয়া হৈ হুল্লোড়
সবই প্যান্ডেলে হবে।
এ হেন মিলন মেলা
কেনা ভালোবাসি
বে এরিয়ার প্রাণ
আমাদের প্রবাসী।
বাড়ুক সুনাম মোদের
বাড়ুক এর যশ,
সব কিছুর কারণ
সভ্যদের পরিশ্রম নিরলস।
সকলের আশীষ নিয়ে
যেন চলতে পারি,
ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন
যেন কভু ভুলতে নারি।।

শিল্পী: Moumita Basu

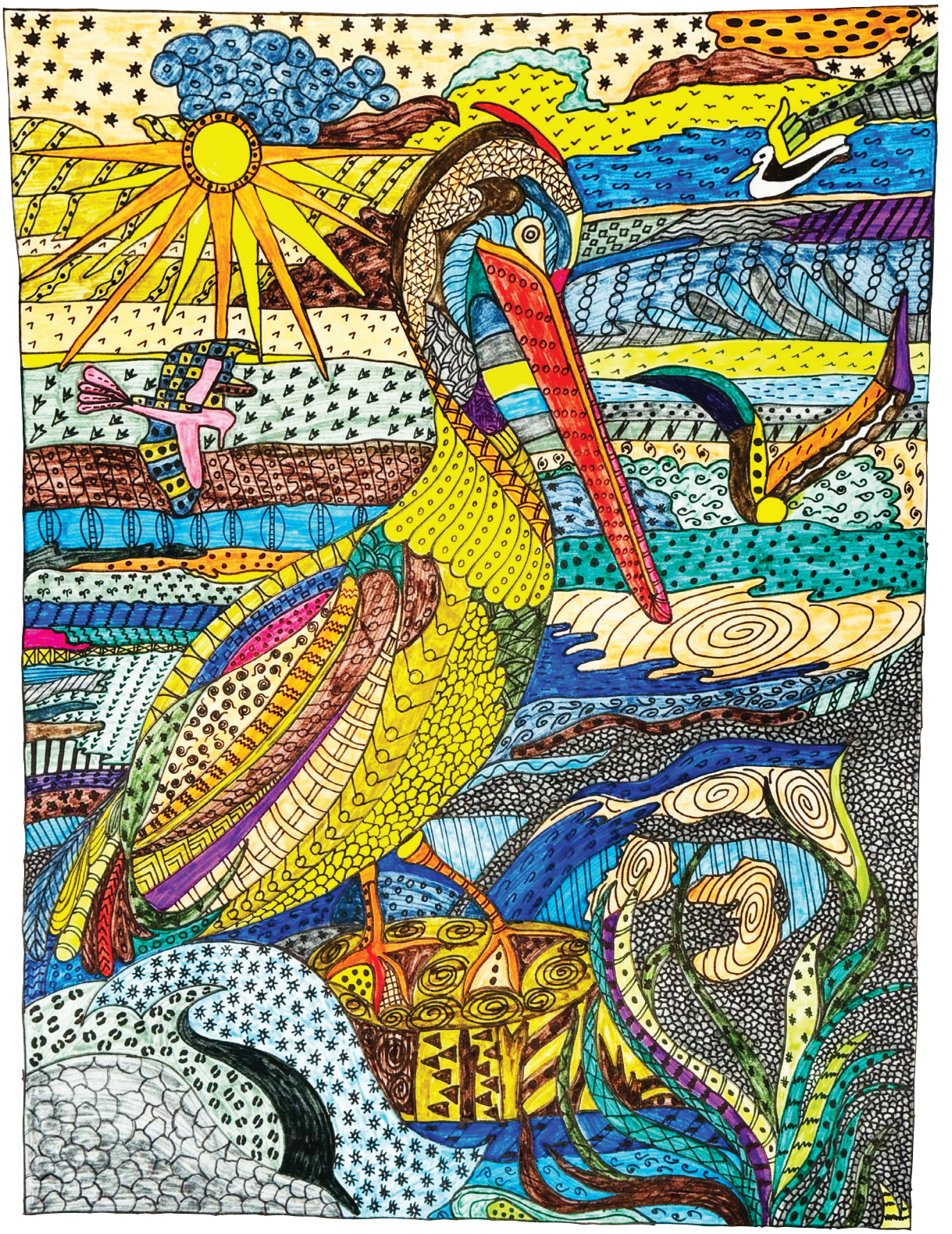

শিল্পী: Moumita Basu

Volunteers

Abhijit Datta
Abhronil Das Gupta
Allya
Amarjit Biswas
Ambar Das
Amrita Paul
Ananya
Ananya Paul
Anik
Aninda Mukherjee
Anindya Pathak
Anjan Das
Anwesha Mukherjee
Archismita
Arijit
Arindam Mukherjee
Arnab Chakrabarty
Arpita Roy Bhattacharya
Ashirbad Ghosh
Ashmit
Ayushi Biswas
Bijoya Saha
Chandan Biswas
Chandan Shee
Chandana
Chitta Ghosh
Debanjan Ghosh
Debarshi
Debarshi Raha
Debashish
Debasis Banerjee
Deepayan Chakraborti
Dipaniwta Datta
Divyansh Chaturvedi
Dolli De
Ekata Banerjee
Geetali Basu
Jaya Chand
Jayashree Ray
Kalapi Roy Neogi
Kallol Chatterjee
Kamalika
Kaushik Ghosh
Kaustavi
Koshi
Mainak Ghosh
Manas Chakraborty
Manidipa
Mohua Dey
Moitreyee
Monika
Monosrija Maity
Moonmita Ghosh
Moumita
NabanitaNiloy Mukherjee
Noori
Parijat
Parijat Mazumdar
Pinaki Gupta
Piu Mallick
Pranati
Prantosh
Prantosh Sivayya
Prasanta De
Priyama Biswas
Rabi Kulshi
Raktim Mahanta
Raya
Repul Dey
Saikat Paul
Sailik
Samarpan Biswas
Sanchita Nupur Pal
Saoli Biswas
Sarbari
Shayari
Somnath Sen
Soumyadeep Roy
Souvik Dutta Chowdhury
Sraboni Saha
Sreyashi Raha
Subhojit Chakraborty
Subir Dutta
Sucheta Roy(Mou)
Sudeshna Raha
Sudip Chattopadhyay
Sudipto Nandi
Sulagna
Supratik Bose
Supratim Basu
Supratim Deb
Sushmita
Susmita Bose
Suswana Chatterjee
Tanima Ganguli
Trisha Sen
Urmi Chakraborty
Vaishali Chaudhuri

Cultural Advisory Counsil

Samita Sen (Prabasi Liaison)
Smt. Mamata Shankar
Shri. Aninda Chatterjee
Shri. Sanjib Bhattacharya

Sincere thanks to Prabasi magazine core team:
Srijoy Aditya, Saoli Biswas, Manas Chakraborty
Sudeshna Raha & Sudipto Mukhopadhyay

TANISHQ
USA

UP TO 20% OFF*
On making charges of Gold &
On Diamond Jewellery value

BAY AREA TRUNK SHOW

3rd to 12th November 2023
11:30am to 7:30pm

Juniper Cupertino Curio Collection by Hilton,
10050 S De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014

Raja SWEETS & CATERING
AUTHORIZED CATERER FOR MAJOR 5-STAR HOTELS
Presents

PARADISE BALLROOMS
banquet hall & event center

ਹਰ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਨਮਦਿਨ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ
200 ਤੋਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੈ।

Services Include

- Catering
- Silverware
- Chinaware
- Decorated Hall
- Linen
- Several Bar Options
- Security
- Wait Staff
- Full Setup Including table cloth, napkins, chairs etc.

Paradise Ballrooms
4100 Peralta Blvd. Fremont, CA 94536
(510) 900-6319
info@paradiseballrooms.com
www.paradiseballrooms.com

Raja™ SWEETS & CATERING®
AUTHORIZED CATERER FOR MAJOR 5-STAR HOTELS
ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ™

ਹਰ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪਰਟੀ
ਲਈ ਦਸ ਹਜਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Follow us on:
Toll Free 1-866-FOR-RAJA
www.rajasweets.com
msbains@rajasweets.com

Fresh Sweets, Snacks & Food
Catering with Portable Tandoor
for up to 10000 guests
Lunch - Dinner - Take Out - Banquets

Items Serving:
- All kinds of Sweets
- Snacks & Food
- Chaat & Tikki Stall
- Pani Poori Stall
- Bhel Poori / Pav Bhaji
- Falooda Kulfi

Catering Services:
- Wedding Ceremonies
- Receptions
- Birthday Parties
- Religious Gatherings
- Corporate Events
- Picnics / Bar-b-que

Additional Services:
- Warmers
- Chaffing Dishes
- China & Silverware
- Linen Rental
- Waiters & Bartenders

Raja Sweets & Indian Cuisine
31853 Alvarado Blvd. Union City CA 94587
Ph. (510) 489-9100 Fax (510) 489-9111

Raja Indian Cuisine & Bar
1275 W Winton Ave. Hayward CA 94545
Ph. (510) 264-9300 Fax (510) 264-9345

Call Makhan Bains or Ravinder Singh For Your Next Party
1-866-FOR-RAJA (367-7252)
www.RajaSweets.com

We like to Congratulate and Best Wishes to
Bay Area Prabasi
for celebrating successes at
Golden Jubilee Celebrations.

Nirmalya Modak

Home Loan Advisor

NMLS # 633685

408.829.0041

nmodak@golden1.com

nmodak.golden1homeloans.com

Golden 1 Credit Union - Home Loans